বাংলা জার্নাল অব ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্সেস
Bangla Journal of Interdisciplinary Sciences

ISSN: 2981-8184

Volume 2 (1), 2024

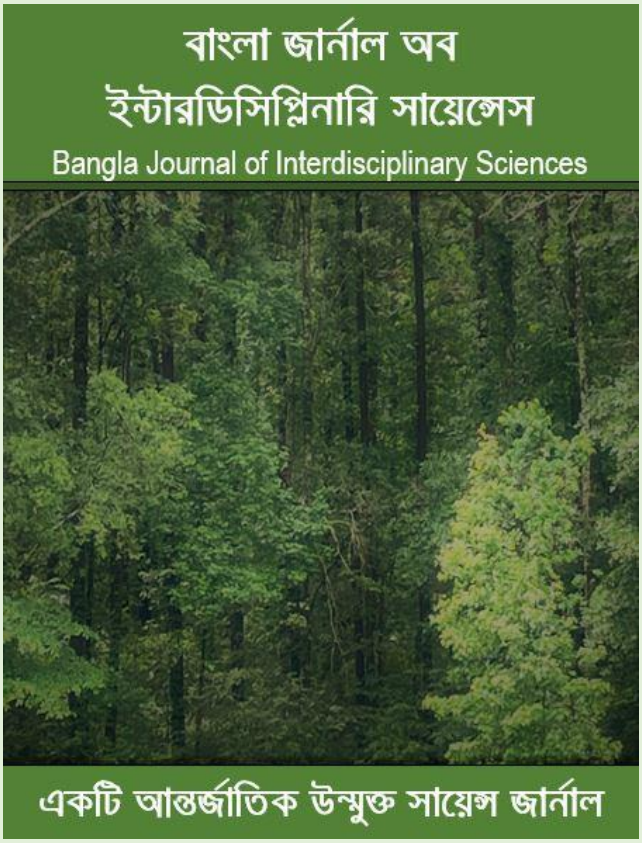

In This Issue:

A Review of the Effectiveness and Safety of Intermittent Fasting *(pp: B1-B9)*
M. Iftekhar Ullah

Dark Matter and Dark Energy: Introduction, Development, and Gravitational Lensing *(pp: B10-B40)*
Ragib A. Khan

Climate-Adaptive Solution to Plastic Waste Management in Bangladesh *(pp: B41-B50)*
Fariha Rahman, Sadik Khan

The Sundarbans, the World's Largest Tidal Halophytic Mangrove Forest: Its Economic and Ecological Significance *(pp: B51-B69)*
M. S. Zaman, Tabina H. Chowdhury

The Bangla Journal of Interdisciplinary Sciences (BJIS) is an international, peer-reviewed, open access journal that publishes scientific articles in Bangla from all branches of science from all around the world.

BJIS especially encourages the younger generation of scientists, and future scientists to publish their research in their mother tongue, and hopes to serve as an effective platform to bring Bengali scientists and science-minded people, who are sacttered throughout the world together for a common goal.

PUBLISH YOUR WORK FOR FREE

Submitted articles must be original works and free from personal, political, and social biases. The respective authors retain the copyrights and are fully responsible for the content they publish.

বাংলা জার্নাল অব ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্সেস

Bangla Journal of Interdisciplinary Sciences

আমাদের এই উদ্যোগে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।
মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে প্রসারিত করুন এবং
আগামী প্রজন্মের মাঝে সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটান।

Level 13, Suite 13.1
32 Smith Street
Parramatta, NSW 2150
Australia

Emails: editorsbjis@banglasciencejournal.com
editorsbjis@gmail.com (preferred)
© Copyright: Bangla Journal of Interdisciplinary Sciences

THE EXECUTIVE BOARD

EDITORS

Md Sarwar Zaman, PhD, FMAS
Professor Emeritus, Alcorn State University
Lorman, MS, USA
Professor, South Texas College
McAllen, TX, USA

Ragib Ahsan Khan, MS
Freelance Author and Researcher
Vienna, Austria

ASSOCIATE EDITORS

Ali Shafqat Akanda, PhD
Associate Professor of Civil Engineering
University of Rhode Island
Kingston, RI, USA

Nilufa Ahsan, PhD
Professor & Chair, Dept. of Bangla
Adamjee Cantonment College
Dhaka, Bangladesh

M. Iftekhar Ullah, MD, MPH
Associate Professor of Medicine
University of Mississippi Medical Center
Jackson, MS, USA

ADMIN & COMMUNICATION

Munzurul Khan
Principal, Keshab Chartered Accountant
Chairman, KHI Partners,
NSW, Australia

THE PRODUCTION TEAM

Bryan Santos, B.Bus
KHI Partners, NSW, Australia
Merger & Acquisition Solutions
NSW, Australia

Rakeen S. Zaman, BS
Software Engineer
C Spire Corporate
Ridgeland, MS, USA

Kamrul A. Khan, MA
Graphic Designer & Sr. Manager
Print Britannia
London, UK

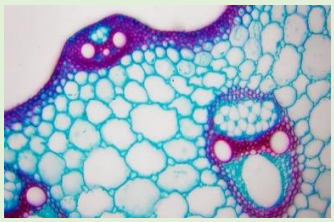

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান আমাদের বেঁচে থাকার একটি প্রধান অবলম্বন। পৃথিবীতে যদিও বহু প্রাণী-প্রজাতি বিলীন হয়ে গেছে, প্রজাতি হিসেবে মানুষ এখনো টিকে আছে তার অন্যতম প্রধান কারণ বিজ্ঞানের সহায়তা। সুদূর অতীতে পাথর ঘষে আগুন জ্বলানো সেটিও ছিল বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের শুরু সেখান থেকেই। আমাদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার তিনটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো বায়ু, পানি এবং মাটি। আর এই তিনটি বিষয়ের অনুসন্ধান বিজ্ঞানেরই অন্তর্ভূক্ত।

বিজ্ঞানীরা খুঁজে বেড়ান যথার্থ প্রশ্ন - যে কথাটি বিজ্ঞানী নিউন ল্যাদারম্যান অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলে গেছেন, "If the universe answer, what is the question?" বিজ্ঞানীরা সঠিক প্রশ্নগুলির মাধ্যমে সমস্যার গুরুত্ব ও সমাধান অনুসন্ধান করেন; যার বাস্তবায়নের দ্বায়িত্ব বহুলাংশে দর্শন ও রাজনীতির। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বর্তমান বিশ্বে দর্শনে প্রবেশ করেছে স্থবিরতা, আর রাজনীতি হয়ে পড়েছে নিয়মনীতি বর্জিত।

বায়ু, পানি ও মাটির কথা বলছিলাম। এগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আমাদের বেঁচে থাকার প্রধানতম অবলম্বন। এগুলোর সুষম ব্যবহারের সাথে জড়িয়ে আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আত্ম-অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্ন। এ বক্তব্যের প্রেক্ষাপটেই আমাদের বর্তমান সংখ্যায় দুটি প্রবন্ধ অত্যন্ত সময়োচিত সংযোজন। অধ্যাপক সারওয়ার জামান এবং বিজ্ঞানী ফারিহা রহমানের প্রবন্ধ দুটি। সুন্দরবন বাংলাদেশের এবং সারা বিশ্বের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এক অমূল্য সম্পদ। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের যে বিশাল অবহেলা ও অপব্যবহার হচ্ছে তা ভয়ংকর। ফারিহা রহমানের প্লাস্টিক বর্জ্যের ওপর প্রবন্ধটিও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই বর্জ্য থেকেও প্রকৃতি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্ব এ সমস্যায় জর্জরিত। ২০২২ সালের ৩০ জুন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিউ গুটেরাস এক প্রবন্ধে* বলেছেন "The world is burning, we need a renewables revolution"।

পরিশেষে সুস্থ, সুন্দর ও বাসযোগ্য পৃথিবী গঠনের লক্ষ্যে বাংলাভাষায় আরো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনা এবং এ জার্নালে কিছু প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য বর্তমান সময়ের গবেষকদের আমি উদাত্ত আহবান জানাই।

THE EDITORIAL BOARD

Syed Muniruzzaman, PhD
Assoc. Professor of Biology
Xavier University, New Orleans, LA, USA

Robert C. Sizemore, PhD
Professor of Biology
Alcorn State University, MS, USA

বাংলা জার্নাল অব
ইন্টারডিসিপ্লিনারি
সায়েন্সেস

বর্তমান ও আগামী
প্রজন্মের জন্য
বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার
একটি মাধ্যম

Pictures: gettyimages.com

* *https://unsdg.un.org/latest/blog/world-burning-we-need-renewables-revolution*

রাগিব আহসান খান
ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

Acknowledgement to the Reviewers

We are pleased to announce the release of the first issue of Volume 2 of the Bangla Journal of Interdisciplinary Sciences (BJIS).

The process of reviewing scientific papers is both demanding and time-consuming, often made more challenging by reviewers' other commitments. We are grateful for the unwavering support from our dedicated reviewers, whose extensive qualifications and expertise have been crucial. On behalf of the journal, we extend our sincere gratitude to our reviewers for generously contributing their time and knowledge to evaluate the manuscripts for this issue.

We also wish to extend special recognition to Dr. Nilufa Ahsan and Mr. Md. Somir Ali for their exceptional work in proofreading the manuscripts before final publication. Their meticulous attention to detail has been vital in upholding the quality of our journal.

Thank you once again to everyone for your invaluable contributions, which are essential to the continued success and growth of BJIS.

M. S. Zaman
Texas, USA

Table of Contents

A Review of the Effectiveness and Safety of Intermittent Fasting B1-B9

M. Iftekhar Ullah

Department of Medicine, University of Mississippi Medical Center, Jackson, Mississippi 39216, USA.

Dark Matter and Dark Energy: Introduction, Development, and Gravitational Lensing B10-B40

Ragib A. Khan

Freelance Author and Researcher, Vienna, Austria.

Climate-Adaptive Solution to Plastic Waste Management in Bangladesh B41-B50

Fariha Rahman[1,*], Sadik Khan[1]

[1]Department of Civil and Environmental Engineering & Industrial Systems and Technology, Jackson State University, Jackson, MS 39217

The Sundarbans, The World's Largest Halophytic Mangrove Forest: Its Economic and Ecological Significance B51-B69

M. S. Zaman[1,2*], Tabina H. Chowdhury[3]

[1]Department of Biological Sciences, Alcorn State University, Lorman, MS 39076, USA;
[2]Department of Biology, South Texas College, McAllen, TX 78501, USA;
[3]Edmond Memorial Highschool, Edmond, OK 73013, USA.

An open-access APC-free journal
ISSN: 2981-8184

REVIEW PAPER

A Review of the Effectiveness and Safety of Intermittent Fasting

M. Iftekhar Ullah

Department of Medicine
University of Mississippi Medical Center
Jackson, Mississippi 39216, USA

Correspondence: M. Iftekhar Ullah
Email: mullah@umc.edu

Received: 5/14/2024 / Accepted: 6/2/2024

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12707556

Abstract

Fasting has been an integral part of human lifestyle since ancient times. It has been practiced in various religions and it takes different forms across cultures and traditions. In contemporary society, intermittent fasting has gained popularity as a lifestyle choice because it allows people to adopt this lifestyle without drastically changing their dietary habits. It is a dietary approach that involves alternating planned periods of fasting with regular eating. This approach does not require individuals to significantly change their current eating habits. Moreover, it does not necessitate individuals to avoid food groups or closely monitoring calorie intake. It has certain health benefits including weight reduction, improvement in energy, and better blood sugar control. However, not everyone may be an appropriate candidate for intermittent fasting. This article will discuss various types of intermittent fasting and their contributions to health based on current scientific findings.

Keywords: Intermittent fasting, fasting, obesity, Ramadan

Citation: *Ullah, M. Iftekhar. 2024, A Review of the Effectiveness and Safety of Intermittent Fasting, Bangla J. Interdisciplinary Sci., 2 (1): B1-B9.*

বিরতিপূর্ণ উপবাসের (Intermittent Fasting) কার্যকারিতা এবং সুরক্ষা সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

সারাংশ

প্রাচীনকাল থেকে উপবাস মানুষের জীবনযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা বছরের বিভিন্ন দিন এবং মাসে উপবাস পালন করে থাকে। আধুনিক কালে বিরতিপূর্ণ উপবাস (intermittent fasting) জীবনযাত্রার একটি জনপ্রিয় অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে কারণ এটি মানুষকে তাদের বিদ্যমান খাদ্যাভ্যাস মারাত্মকভাবে পরিবর্তন না করেই এই জীবনধারা গ্রহণ করতে দেয়। এটি এমন একটি খাদ্যাভ্যাস যেখানে পরিকল্পিতভাবে দিনের বা সপ্তাহের কিছু নির্দিষ্ট সময় উপবাস রাখা হয়। এটি পালন করার জন্য বিদ্যমান খাদ্যাভ্যাস ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না, বা ক্যালোরি গ্রহণের বিষয়টিও সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না। ওজন হ্রাস, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি এবং রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণসহ এর আরো কিছু স্বাস্থ্য সুবিধা রয়েছে। তবে বিরতিপূর্ণ উপবাস সবার জন্য নিরাপদ বা কার্যকরী নাও হতে পারে। এ প্রবন্ধে বিভিন্ন ধরনের বিরতিপূর্ণ উপবাস এবং স্বাস্থ্যের উন্নতিতে এর ভূমিকা সম্পর্কিত বর্তমান বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

মূল শব্দগুলি: বিরতিপূর্ণ উপবাস, উপবাস, স্থূলতা, রোজা

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে উপবাস মানুষের জীবনযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা বছরের বিভিন্ন দিন এবং মাসে উপবাস পালন করে থাকে। আধুনিক কালে বিরতিপূর্ণ উপবাস জীবনযাত্রার একটি জনপ্রিয় অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। ওজন হ্রাস, স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং খাদ্যাভাস সহজ করা সহ বিভিন্ন কারণে আজকাল এটি ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি এমন একটি খাদ্যাভ্যাস যেখানে পরিকল্পিতভাবে দিনের বা সপ্তাহের কিছু নির্দিষ্ট সময় উপবাস পালন করা হয়। ওজন হ্রাস এবং বিপাকীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে এটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, দৈনিক আহারের সময় সীমা ৬ ঘন্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দিনের বাকি ১৮ ঘণ্টা উপবাস করলে তা বিপাক (metabolism) ব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন আনে- যা শরীরের গ্লুকোজ-ভিত্তিক শক্তি (energy) উৎপাদন প্রক্রিয়াকে কিটোন-ভিত্তিক শক্তি উৎপাদনে রূপান্তর করতে পারে, যা মানসিক চাপ (stress) প্রতিরোধ, স্থূলত্ব হ্রাস, এবং ক্যান্সার রোগের প্রকোপ হ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে (de Cabo and Mattson, 2019) । বিরতিপূর্ণ উপবাসের সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হতে পারে এর সরলতা (simplicity)। এটি পালন করার জন্য

বিদ্যমান খাদ্যাভ্যাস ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না, বা ক্যালোরি গ্রহণের বিষয়টিও সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না। এ বৈশিষ্ট্যগুলো খাদ্যাভাসের সহনশীলতাকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে এটাকে সহজে গ্রহণযোগ্য করে তোলে (Varady et al., 2021)।

প্রাচীনকালের ধর্ম ও অঞ্চল ভিত্তিক উপবাস

হাজার বছর ধরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ উপবাস রেখে আসছে এবং আধুনিক যুগেও তা অনুসরণ করা হচ্ছে। ধর্ম ও অঞ্চল ভিত্তিক উপবাসের কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল:

ইসলাম ধর্ম: মুসলমানরা পুরো রমজান মাস উপবাস রাখেন- যা রোজা হিসাবে পরিচিত। এ সময় তারা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাবার বা পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। কেউ কেউ সোমবার ও বৃহস্পতিবার উপবাস পালন করেন। ইসলামিক ক্যালেন্ডারের অন্যান্য কিছু দিনেও রোজা পালন করা হয়।

খ্রিস্টান ধর্ম: অনেক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইস্টারের আগে ৪০ দিন উপবাস পালন করে থাকেন- যা লেন্ট (lent) নামে পরিচিত। গুড ফ্রাইডেতে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়াকে স্মরণ করেও উপবাস পালন করা হয়। কপটিক খ্রিস্টানরা সারা বছরে বিভিন্ন সময়সীমার জন্য মোট ২১০ দিনের জন্য উপবাস করে থাকেন।

ইহুদী ধর্ম: ইহুদী ধর্মাবলম্বীরা ইয়োম কিপ্পুরের দিন ২৫ ঘণ্টা উপবাস করে থাকেন। এটা ইয়োম কিপ্পুরের আগের দিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পূর্ব থেকে ইয়োম কিপ্পুরে সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহুদি ধর্মে আরো কয়েকটি ছোটোখাটো উপবাসের দিন রয়েছে।

বাহাই ধর্ম: বাহাইরা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত মার্চ মাসে) সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উনিশ দিনের উপবাস পালন করে থাকেন। এ সময়ে মূলত দিনের বেলায় খাবার খাওয়া এবং পানীয় পান উভয় থেকেই বিরত থাকা হয়।

হিন্দু ধর্ম: অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী মাসে দুইবার একাদশীতে উপবাস করেন। এছাড়া নবরাত্রির সময় অনেকে নয়দিন পর্যন্ত উপবাস পালন করে থাকেন।

বৌদ্ধ ধর্ম: বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা উপোসথের সময় উপবাস পালন করে থাকেন। এ সময় তারা দুপুর থেকে পরের দিন ভোর পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকেন।

জৈন ধর্ম: জৈন ধর্মাবলম্বীরা পর্যুষণ নামে একটি বার্ষিক আট দিনের উপবাস পালন করেন।

আধুনিক কালের বিরতিপূর্ণ উপবাস

বিরতিপূর্ণ উপবাস মূলত তিন ধরনের: সীমাবদ্ধ সময়ে খাদ্য গ্রহণ (Time restricted eating), ৫:২ খাদ্যাভ্যাস (5:2 diet) এবং বিকল্প দিন উপবাস (Alternate day fasting) (Varady et al., 2021)।

সীমাবদ্ধ সময়ে খাদ্য গ্রহণ: এ পদ্ধতিতে প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১৬:৮ উপবাস পদ্ধতিতে একটানা ১৬ ঘন্টা উপবাস করে খাদ্য গ্রহণ ৮ ঘণ্টা

সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এর আরেকটি প্রকরণ হলো ১২ ঘন্টা উপবাস রেখে বাকি ১২ ঘণ্টায় খাদ্য গ্রহণ (১২:১২)।

৫:২ খাদ্যাভ্যাস: এ পদ্ধতিতে সপ্তাহে পাঁচ দিন স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা হয় এবং তারপর উপর্যুপরি দুই দিন উপবাস (অথবা খুব কম ক্যালোরি গ্রহণ) করা হয়।

বিকল্প-দিন উপবাস: এ পদ্ধতিতে একদিন উপবাস রেখে পরের দিন স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করা হয়। উপবাসের দিনগুলোতে অনেকে খাদ্য গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে। আবার অনেকে অতি সামান্য (৫০০ ক্যালোরির কম) খাদ্যগ্রহণ করে ।

বিরতিপূর্ণ উপবাস কীভাবে কাজ করে?

এটি ধারণা করা হয় যে, বিরতিপূর্ণ উপবাস শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি (internal clock), পাচনতন্ত্রের অণুজীবের সংমিশ্রণ (microorganism composition in gastrointestinal tract) এবং খাদ্যাভ্যাসের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। একটানা খাওয়া, বিশেষ করে রাতের বেলা খাদ্যগ্রহণ শারীরবৃত্তীয় বিপাককে ব্যাহত করে এবং স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এসব জৈবিক এবং শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত একটি প্রতিকূল বিপাকীয় পরিবেশ তৈরি করতে পারে- যা স্থূলত্ব, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। দীর্ঘ উপবাস এ শারীরবৃত্তীয় পরিবেশ পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে (Patterson and Sears, 2017)।

বিরতিপূর্ণ উপবাস বিভিন্ন উপায়ে বিপাকীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে। যেমন: ফ্রি রেডিক্যালের উৎপাদন হ্রাস, স্ট্রেস প্রতিরোধে শরীরের ক্ষমতা বাড়ানো, রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রদাহ (inflammation) হ্রাস করা (Chaix et al., 2019; de Cabo and Mattson, 2019; Mattson et al., 2017)। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিরতিপূর্ণ উপবাস ক্লান্তি প্রশমন এবং ক্যান্সার রোগীদের জন্য পরিপাকতন্ত্রের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হ্রাস করতে পারে। এটি ডিএনএ-এর ক্ষতি হ্রাস করতে পারে এবং অনুকূল সেলুলার-স্তরের প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং পুনর্নির্মাণকে প্ররোচিত করতে পারে (Li Sucholeiki et al., 2024)। গবেষণায় আরো জানা গেছে যে, উপবাস mammalian target of rapamycin (mTOR) এর লক্ষ্য হিসাবে পরিচিত একটি মূল প্রোটিন সংশ্লেষণ পথের ক্রিয়াকলাপ হ্রাস করার মাধ্যমে অটোফ্যাজি (autophagy) নামক একটি জীবকোষ পরিশুদ্ধকরণ (cellular cleanup) প্রক্রিয়া সক্রিয় করতে পারে। এই ক্রিয়াকলাপগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা প্রোটিন সংশ্লেষণ হ্রাসের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ অণুগুলো নির্মূল করতে এবং তাদের অংশগুলো পুনর্ব্যবহার করতে সহায়তা করে (Bagherniya et al., 2018; Chaix et al., 2019; Mattson et al., 2017; Varady et al., 2021)।

সীমাবদ্ধ সময়ে খাদ্যগ্রহণ (time restricted eating) খাওয়া-দাওয়ার সময়কে হ্রাস করে ঠিকই, তবে অনুমোদিত সময়ে কী পরিমাণ খাওয়া যেতে পারে তা নির্দেশ করে না। যেহেতু খাবারের ধরন এবং পরিমাণ পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না তাই মানুষ এ নতুন খাদ্যাভ্যাসের সাথে সহজেই অভ্যস্ত হতে পারে। প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণের সময়সীমা ৪ থেকে ১০ ঘন্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে ক্যালোরি গ্রহণ

অজান্তেই ১০% থেকে ৩০% হ্রাস পেতে পারে- যা প্রতিদিন প্রায় ২০০ থেকে ৬০০ ক্যালোরি হ্রাসের সমতুল্য (Cienfuegos et al., 2020; Gabel et al., 2018; Wilkinson et al., 2020)। বিকল্প দিনের উপবাস রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরলের মাত্রায় অনুকূল প্রভাব ফেলে। দেখা গেছে যে, এটি উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক উভয় রক্তচাপ ৫-১০% কমাতে সাহায্য করে। এটি এলডিএল এর (LDL) মাত্রাও ১৫-২০% হ্রাস করে(Catenacci et al., 2016; Eshghinia and Mohammadzadeh, 2013; Hoddy et al., 2014; Stekovic et al., 2019)। বিরতিপূর্ণ উপবাস রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ এবং ইনসুলিন প্রতিবন্ধকতা (insulin resistance) হ্রাস করতে সহায়তা করে। এটি অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের চিহ্নিতকারীর (markers of oxidative stress) মাত্রাও হ্রাস করে (Gabel et al., 2019; Sutton et al., 2018; Trepanowski et al., 2017)।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যখন ১৫ থেকে ২১ দিনের জন্য রমজানের উপবাস পালন করেন, তখন তাদের হিমোগ্লোবিন এ ১ সি (HbA1C) এর মাত্রা প্রায় 0.5 হ্রাস পায়। এটি রোজার স্বল্প সময়ে রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট উন্নতির সূচক। আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ল্যাটার-ডে সেন্টস অফ জেসাস ক্রাইস্টের চার্চের (Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints) অনুসারীদের ২৯% যারা নিয়মিত উপবাস অনুশীলন করেন তাদের শরীরের ওজন এবং উপবাসকালীন রক্তে শর্করার মাত্রা (fasting blood sugar) উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। উপরন্তু, নতুন করে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার হার ০.৪১ গুণ হ্রাস পায় এবং করোনারি স্টেনোসিসের প্রকোপও ০.৪২ গুণ হ্রাস পায় (Horne et al., 2008)। নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ (NAFLD) দীর্ঘস্থায়ী লিভারের প্রদাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ- যার প্রকোপ স্থূলতা (obesity) বৃদ্ধির কারণে বিশ্বব্যাপী বাড়ছে। এ রোগের অগ্রগতি বন্ধ করা কঠিন কারণ এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে ওজন হ্রাস এ ফ্যাটি লিভার রোগের মৌলিক চিকিৎসা। বেশ কয়েকটি গবেষণার মেটানালাইসিস (metanalysis) এ দেখা যায় যে, নিয়ন্ত্রণ গ্রুপ (control group) এর তুলনায় বিরতিপূর্ণ উপবাস শরীরের ওজন, বডি মাস ইনডেক্স (BMI), অ্যালানাইন অ্যামিনোট্রান্সফেরাজ (ALT) এবং অ্যাস্পার্টেট ট্রান্স এমাইনেজ (AST) হ্রাসে সহায়তা করে (Horne et al., 2008; Yeoh et al., 2015; Yin et al., 2021)।

বিরতিপূর্ণ উপবাস পালন করা কি নিরাপদ?

ধর্মীয় কারণ ছাড়াও স্বাস্থের উন্নতির জন্য আজকাল অনেকে বিরতিপূর্ণ উপবাস পালন করে থাকেন। সাধারণত ডাক্তারের সাথে কোনোরকম পরামর্শ করা ছাড়াই মানুষ এটি করে। তবে প্রশ্ন হলো, এটা কি সবার জন্য নিরাপদ? সাম্প্রতিক কয়েকটি গবেষণায় বিরতিপূর্ণ উপবাসের নিরাপত্তা (safety) পরীক্ষা করা হয়। পরিপাকতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, হরমোন বা বিপাকের উপরে সামান্য প্রতিকূল প্রভাব তৈরি করা ছাড়া বিরতিপূর্ণ উপবাস সাধারণত অপেক্ষাকৃত নিরাপদ (Varady et al., 2022)। আরেক গবেষণায় দেখা গেছে ক্ষুধা পাওয়া, মেজাজ খারাপ হওয়া এবং মানসিক অবসাদের মতো সাধারণ মৃদু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো

প্রায়শই উপবাসের প্রথম মাসের পরে হ্রাস পায়। আর তিন মাসের বিরতিপূর্ণ উপবাসের পর কোনোরকম শারীরিক জটিলতা ছাড়াই মানুষের জীবনযাত্রার মানের (quality of life) উন্নতি হয় এবং শারীরিক ক্লান্তি হ্রাস পায় (Anic et al., 2022)। একটি সমীক্ষায় টাইপ-2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে (যারা চিকিৎসার জন্য ইনসুলিন গ্রহণ করছেন) সপ্তাহে পর পর ৩ দিন করে ১২ সপ্তাহের উপবাসের নিরাপত্তা (safety) মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে যে, রক্তে শর্করা আশঙ্কাজনক ভাবে কমে যাওয়া (hypoglycemia) ছাড়াই অংশগ্রহণকারী রোগীদের হিমোগ্লোবিন A1C উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায় (-৭.৩ ± ১২.০ 0 মিলিমোল/মোল) (Obermayer et al., 2023)। এমনকি টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত স্থূল (obese) লোকদের মধ্যেও হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ঘটনা বৃদ্ধি না করে ওজন হ্রাসে বিরতিপূর্ণ উপবাস কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে (Overland et al., 2018)। বিরতিপূর্ণ উপবাসের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ না কমিয়েই যে পরিমাণ ওজন হ্রাস হয়, তার পরিমাণ প্রচলিত ডায়েটিং পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ওজন হ্রাসের সাথে তুলনীয় (যেখানে প্রতিদিনের ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমাতে হয়) (Varady et al., 2022)।

বিরতিপূর্ণ উপবাস সাধারণভাবে নিরাপদ হলেও যারা গর্ভবতী বা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন, বাড়ন্ত বয়সের শিশু ও কিশোর/কিশোরী, যাদের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম (underweight), এবং যাদের খাওয়ার অরুচি সংক্রান্ত ব্যাধিতে (eating disorder) আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে- তাদের বিরতিপূর্ণ উপবাস এড়িয়ে চলা উচিত (Aoun et al., 2020)। আর যারা টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, অথবা টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি যারা ইনসুলিন বা ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক (oral hypoglycemic) ব্যবহার করেন, বা যারা জটিল যকৃতের রোগে আক্রান্ত (advanced liver disease), বিরতিপূর্ণ উপবাস শুরু করার আগে তাদের ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত।

উপসংহার

সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসারে বিরতিপূর্ণ উপবাস ওজন হ্রাস এবং স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্নভাবে উপকারী হতে পারে। যাদের স্বাস্থ্য তুলনামূলকভাবে ভালো, তারা এটি অনায়াসেই পালন করতে পারেন। তবে যাদের ডায়াবেটিস, অপুষ্টি, ও যকৃতের প্রদাহ জাতীয় স্বাস্থ্যগত জটিলতা আছে, উপবাস পালনের পূর্বে তাদের অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত।

তথ্যসূত্র

Anic, K., Schmidt, M. W., Furtado, L., Weidenbach, L., Battista, M. J., Schmidt, M., Schwab, R., Brenner, W., Ruckes, C., Lotz, J., Lackner, K. J., Hasenburg, A., & Hasenburg, A. 2022, Intermittent Fasting-Short- and Long-Term Quality of Life, Fatigue, and Safety in Healthy Volunteers: A Prospective, Clinical Trial. Nutrients, 14 (19): 4216. https://doi.org/10.3390/nu14194216

Aoun, A., Ghanem, C., Hamod, N., & Sawaya, S. 2020, The Safety and Efficacy of Intermittent Fasting for Weight Loss. Nutrition Today, 55 (6): 270-277. https://doi.org/10.1097/NT.0000000000000443

Bagherniya, M., Butler, A. E., Barreto, G. E., & Sahebkar, A. 2018, The effect of fasting or calorie restriction on autophagy induction: A review of the literature. Ageing Research Reviews, 47, 183-197. https://doi.org/10.1016/J.ARR.2018.08.004

Catenacci, V. A., Pan, Z., Ostendorf, D., Brannon, S., Gozansky, W. S., Mattson, M. P., Martin, B., MacLean, P. S., Melanson, E. L., Donahoo, T. W. 2016, A randomized pilot study comparing zero-calorie alternate-day fasting to daily caloric restriction in adults with obesity. Obesity, 24 (9): 1874-1883. https://doi.org/10.1002/oby.21581

Chaix, A., Manoogian, E. N. C., Melkani, G. C., Panda, S. 2019, Time-Restricted Eating to Prevent and Manage Chronic Metabolic Diseases. Annual Review of Nutrition, 39 (1): 291-315. https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-082018-124320

Cienfuegos, S., Gabel, K., Kalam, F., metabolism, M. E.C. 2020, Effects of 4-and 6-h time-restricted feeding on weight and cardiometabolic health: a randomized controlled trial in adults with obesity. Cell Metabolism, 32 (3): 366-378.

de Cabo, R., Mattson, M. P. 2019, Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease. New England Journal of Medicine, 381(26): 2541-2551. https://doi.org/10.1056/NEJMra1905136

Eshghinia, S., Mohammadzadeh, F. 2013, The effects of modified alternate-day fasting diet on weight loss and CAD risk factors in overweight and obese women. J Diabetes Metab Disord, 4.

Gabel, K., Hoddy, K., Haggerty, N., aging, J. S. 2018, Effects of 8-hour time restricted feeding on body weight and metabolic disease risk factors in obese adults: A pilot study. Nutrition and Healthy Aging, 4 (4): 345–353.

Gabel, K., Kroeger, C. M., Trepanowski, J. F., Hoddy, K. K., Cienfuegos, S., Kalam, F., Varady, K. A. 2019, Differential Effects of Alternate-Day Fasting Versus Daily Calorie Restriction on Insulin Resistance. Obesity, 27 (9): 1443-1450. https://doi.org/10.1002/oby.22564

Hoddy, K. K., Kroeger, C. M., Trepanowski, J. F., Barnosky, A., Bhutani, S., Varady, K. A. 2014, Meal timing during alternate day fasting: Impact on body weight and cardiovascular disease risk in obese adults. Obesity, 22 (12): 2524-2531. https://doi.org/10.1002/oby.20909

Horne, B., May, H., Anderson, J. 2008, Usefulness of routine periodic fasting to lower risk of coronary artery disease in patients undergoing coronary angiography. The American Journal of Cardiology, 102 (7): 814-819.

Li Sucholeiki, R., Propst, C. L., Hong, D. S., & George, G. C. 2024, Intermittent fasting and its impact on toxicities, symptoms and quality of life in patients on active cancer treatment. Cancer Treatment Reviews, 126: 102725. https://doi.org/10.1016/J.CTRV.2024.102725

Mattson, M. P., Longo, V. D., Harvie, M. 2017, Impact of intermittent fasting on health and disease processes. Ageing Research Reviews, 39: 46-58. https://doi.org/10.1016/J.ARR.2016.10.005

Obermayer, A., Tripolt, N. J., Pferschy, P. N., Kojzar, H., Aziz, F., Müller, A., Schauer, M., Oulhaj, A., Aberer, F., Sourij, C., Habisch, H., Madl, T., Pieber, T., Obermayer-Pietsch, B., Stadlbauer, V., Sourij, H. 2023, Efficacy and Safety of Intermittent Fasting in People With Insulin-Treated Type 2 Diabetes (INTERFAST-2)—A Randomized Controlled Trial. Diabetes Care, 46 (2): 463-468. https://doi.org/10.2337/dc22-1622

Overland, J., Toth, K., Gibson, A. A., Sainsbury, A., Franklin, J., Gauld, A., Wong, J. 2018, The safety and efficacy of weight loss via intermittent fasting or standard daily energy restriction in adults with type 1 diabetes and overweight or obesity: A pilot study. Obesity Medicine, 12: 13-17. https://doi.org/10.1016/J.OBMED.2018.11.001

Patterson, R. E., Sears, D. D. 2017, Metabolic Effects of Intermittent Fasting. Annual Review of Nutrition, 37 (1): 371–393. https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-071816-064634

Stekovic, S., Hofer, S., Tripolt, N., Aon, M.2019, Alternate day fasting improves physiological and molecular markers of aging in healthy, non-obese humans. Cell Metabolism, 30 (1-5): 462-476.

Sutton, E., Beyl, R., Early, K., Cefalu, W. 2018, Early time-restricted feeding improves insulin sensitivity, blood pressure, and oxidative stress even without weight loss in men with prediabetes. Cell Metabolism, 27: 6.

Trepanowski, J., Kroeger, C. 2017, Effect of alternate day fasting on weight loss, weight maintenance, and cardioprotection among metabolically healthy obese adults: a randomized clinical trial. JAMA Internal Medicine, 177: 7.

Varady, K. A., Cienfuegos, S., Ezpeleta, M., Gabel, K. 2021, Cardiometabolic Benefits of Intermittent Fasting. Annual Review of Nutrition, 41 (1): 333-361. https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-052020-041327

Varady, K. A., Cienfuegos, S., Ezpeleta, M., Gabel, K. 2022, Clinical application of intermittent fasting for weight loss: progress and future directions. Nature Reviews Endocrinology, 18 (5): 309-321. https://doi.org/10.1038/s41574-022-00638-x

Wilkinson, M., Manoogian, E., Zadourian, A. 2020, Ten-hour time-restricted eating reduces weight, blood pressure, and atherogenic lipids in patients with metabolic syndrome. Cell Metabolism, 31 (1): 92-104.

Yeoh, E., Zainudin, S., Loh, W. 2015, Fasting during Ramadan and associated changes in glycaemia, caloric intake and body composition with gender differences in Singapore. Ann Acad Med Singapore, 44 (6): 202-206.

Yin, C., Li, Z., Xiang, Y., Peng, H., Yang, P., Yuan, S., Zhang, X., Wu, Y., Huang, M., & Li, J. 2021, Effect of Intermittent Fasting on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Nutrition, 8: 709683. https://doi.org/10.3389/fnut.2021.709683

An open-access APC-free journal
ISSN: 2981-8184

REVIEW PAPER

Dark Matter and Dark Energy: Introduction, Development, and Gravitational Lensing

Ragib A. Khan
Freelance Author and Researcher
Vienna, Austria, +43

Correspondence: Ragib. A. Khan
Email: ragibahsankhan@gmail.com

Received: 4/15/2024; Accepted: 6/7/2024

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12735764

Abstract

Scientists have solidified their understanding of dark matter and energy, confirming their existence. However, while dark energy has been observed and verified, dark matter remains elusive. The characteristics of these phenomena are still not fully comprehended, with dark matter remaining a theoretical construct. This article offers a summary of the historical context and contemporary advancements in the theories of dark matter and dark energy, along with the current areas of research, methodologies, preliminary scientific hypotheses, and key research techniques such as gravitational lensing for studying dark matter and energy.

Keywords: Baryonic matter, non-baryonic matter, MACHOs, WIMPs, gravitational lensing, thermal relics

Citation: *B1-B9. Khan, R.A. 2024, Dark Matter and Dark Energy: Introduction, Development, and Gravitational Lensing, Bangla J. Interdisciplinary Sci., 2 (1): B10-B40.*

ডার্ক মেটার এবং এনার্জির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ক্রমবিকাশ এবং মহাকর্ষীয় লেন্সিং

সারাংশ

বিজ্ঞানীরা ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছেন। অবশ্য ডার্ক এনার্জীর অস্তিত্ব তাঁরা পর্যবেক্ষণগতভাবে প্রমাণ করতে পেরেছেন, কিন্তু ডার্ক মেটার অস্তিত্বকে এখনো পর্যবেক্ষণগত ভাবে প্রমাণ করতে পারেননি। ডার্ক মেটার বিষয়টি এখন পর্যন্ত তাত্ত্বিক প্রকল্প মাত্র। এই প্রবন্ধে প্রথমে ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জী তত্ত্বের বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং আধুনিক বিকাশের ক্রমধারাকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জী কাজের এলাকা, মাধ্যম-পদ্ধতিসহ বৈজ্ঞানিক (প্রাকল্পিক) সিদ্ধান্তগুলির পরিচয় অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে, এবং ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর ওপর গবেষণার অন্যতম মূল মাধ্যম-পদ্ধতি গ্রেভিটেশন্যাল লেন্সিং (Gravitational Lensing, GL) এর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

মূল শব্দগুলি: ব্যরিয়নিক ও নন-ব্যরিয়নিক উপাদান, MACHOs, WIMPs, Gravitational Lensing, Thermal Relics

ভূমিকা

ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জী বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সাথে কোনো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে না; আলো বিকিরণ, শোষণ বা প্রতিফলনও করেনা, যেকোনো ব্যারিয়নিক উপাদানের সাথে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে না। এটি বিকর্ষণধর্মী এবং নন-ব্যরিয়নিক । তাই এখন পর্যন্ত এদেরকে প্রযুক্তি ও পদ্ধতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে শনাক্ত করা যায় নি। বিজ্ঞানীরা প্রধাণত কণাপদার্থবিদ্যা, জ্যোতিপদার্থ বিদ্যা (Astrophysics), জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy), স্যাটেলিট থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত্ব, GL (Gravitational Lensing) প্রযুক্তি-পদ্ধতি এবং CMBR (Cosmic Microwave Background Radiation) বিকিরণের তথ্য-উপাত্তের সহায়তায় ডার্ক এনার্জী এবং ডার্ক মেটারের ওপর গবেষণা করছেন। তবে সাম্প্রতিক বিশ্বে বিজ্ঞানীরা এই উপাদান দুটিকে শনাক্ত করতে আরো বেশ কিছু প্রযুক্তি ও পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

স্টার্ন্ডার্ড মডেল অনুযায়ী এই মহাবিশ্ব ১৭টি সাব এটমিক কণা দ্বারা গঠিত (চিত্র ১)। এগুলি হলো ব্যারিয়ন উপাদান। এগুলির বৈশিষ্ট্য হলো- এগুলি পর্যবেক্ষণ করা যায়, এদের ভর আছে, এরা আলো বিকিরণ করে, আলো শোষণ বা প্রতিফলন-প্রতিসরণ করে এবং বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে। আবার মহাবিশ্বের কালোগহ্বর, নিউট্রন তারা White dwarf, Brown dwarf ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তুগুলিকেও ব্যারিয়ন উপাদানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এগুলিকে বলে MACHOs (Massive Compact Halo Objects)।

অন্যদিকে নন ব্যারিয়ন কণাগুলি এখনো অনাবিষ্কৃত। এগুলি এখনো প্রাকল্পিক পর্যায়ে রয়েছে। ধারনা করা হয় নন ব্যারিয়ন কণাগুলি ব্যরিয়ন কণার চেয়ে ক্ষুদ্রতর। বিজ্ঞানের ভাষায় এই কণাগুলিকে বলা হয় WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles)। যেমন- একসিয়ন (Axion), নিউট্রিনো (Neutrino), স্টেরাইল নিউট্রিনো (Sterile Neutrino), নিউট্রালিনো (Neutralino), এস-পার্টিকেলস (S-Particles) সুপার-পার্টনারস (Super-partners), ইত্যাদি।

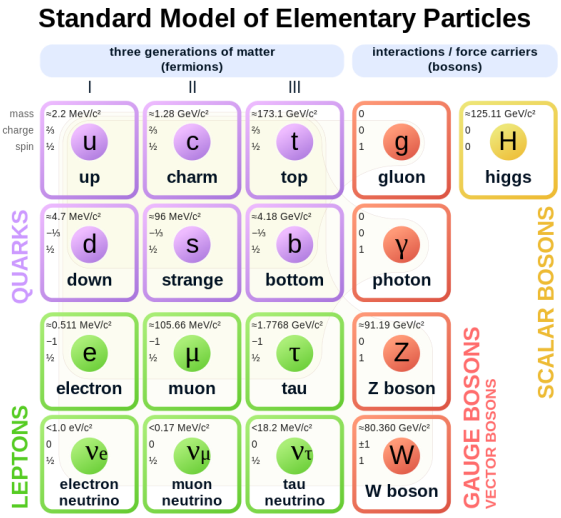

চিত্র ১: Standard Model of Particle Physics (Credit: Wikipedia, 2024a) ।

মহাবিশ্বে প্রচন্ড ভারি বস্তুগুলির বিশাল ভরের কারণে বস্তুগুলির আশেপাশের দেশ-কালে বক্রতার সৃষ্টি হয়। যখন অন্য কোনো মহাজাগতিক ভারী বস্তু থেকে নির্গত রশ্মি এই বক্র দেশ-কালের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তখন সামান্য পরিমাণে বেঁকে যায়; এই প্রক্রিয়াটিই হলো GL (চিত্র ২)। যেমন- কোনো ক্লস্টারের পাশ দিয়ে যখন অন্য কোনো বস্তুর বিকিরণ অতিক্রম করে তখন GL এর সৃষ্টি হয়। এই তথ্য উপাত্ত থেকে বিজ্ঞানীরা ঐ মহাজাগতিক উপাদানটির আকর্ষণ শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করতে পারেন এবং সেই শক্তির পরিমাণ থেকে, গাণিতিকভাবে হিসাব-নিকাশ করে, উপাদানটির ভরও নির্ণয় করতে পারেন। গাণিতিকভাবে হিসাব করে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, সেখানে শক্তির অনুপাতে যে পরিমাণ ভর থাকার কথা, সেখানে তার চেয়ে অনেক কম ভর আছে। এই তথ্যের ভিত্তিতেই বিজ্ঞানীরা "missing mass" এর ধারনায় পৌঁছেন এবং এগুলিকেই তারা ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জী নামকরণ করেন। এই ডার্ক এনার্জী ও ডার্ক মেটার আবিষ্কারের পূর্ব প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাক।

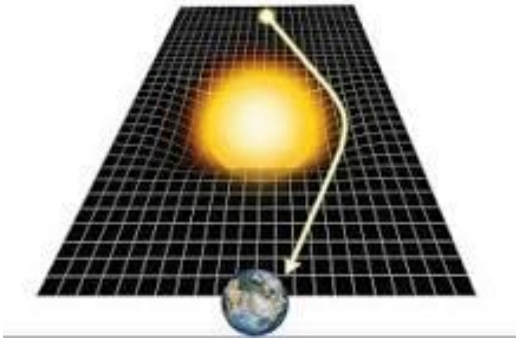

চিত্র ২: As photons pass through the area near a massive object causing significant distortion, their path bends because of the curvature of the space-time they travel through. (Image Credit: Kell, 2019)।

ডার্ক মেটার (Dark Matter): পূর্ব প্রেক্ষাপট

শক্তি ও বস্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শক্তি বস্তুর পরিবর্তিত রূপ, অন্যদিকে শক্তি থেকেই বস্তুর উদ্ভব। তাই শক্তিকে জানতে হলে প্রথমে বস্তুকে অর্থ্যাৎ শক্তির আদি কণাকে জানতে হবে। শক্তির উৎস বা আদি কণাকে জানা না থাকলে শক্তির স্বরূপ ও চরিত্রকে সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ডার্ক মেটার ডার্ক এনার্জীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিকভাবে প্রথমে শক্তির অস্তিত্বকে আবিষ্কার করেন এবং তার প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় অনুমান করেন, শক্তির বাহক বা উৎস হিসেবে এখানে কোনো বস্তুগত উপাদানেরও অস্তিত্ব থাকতে হবে। শুরুতে ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর গবেষণার ক্ষেত্রে এই অবস্থাটিরই সৃষ্টি হয়েছিল।

ডার্ক এনার্জীর আধুনিক ইতিহাস ব্রিটিশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম থমসন কেলভিনের লেখা থেকে প্রথম শুরু হয়। কেলভিন ১৮৮৮ সালে "Baltimore Lectures on Molecular Dynamics and the Wave Theory of Light" নামে যে গ্রন্থটি লেখেন, সেখানে তিনি প্রথম বলেন, মহাকাশে যে অসংখ্য বস্তুরাজি বর্তমান, তার একটা বিশাল অংশ সম্ভবত কালো উপাদান (Dark Body)। তিনি এখানে প্রথম আমাদের গ্যালাক্সি, মিল্কিওয়ে এর কালো উপাদান-এর পরিমাপের চেষ্টা করেন। তিনি প্রথম ছায়াপথের পর্যবেক্ষণক্ষম তারাগুলির বেগের (Velocity) পরিমাপ করেন। তারপর তিনি তারাগুলি কত দ্রুত গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে পরিভ্রমণ করছে, তার পরিমাপ করেন এবং লক্ষ্য করেন গ্যালাক্সির শক্তির পরিমানের কারণে গ্যালাক্সিতে যে পরিমাণ বস্তুগত উপাদান থাকার কথা, তার তুলনায় সেখানে বস্তুগত উপাদানের পরিমাণ অনেক কম। কিন্তু সেখানে কোনো উপাদানের অস্তিত্ব থাকতেই হবে, নয়তো ওই পরিমাণ শক্তি সেখান থেকে উৎপন্ন হতে পারে না। এই অদৃশ্য (Invisible) বস্তুগত উপাদানগুলিকেই তিনি ডার্কবডি (Dark Body) নামকরণ করেন। তিনি এখানে বলেন, "Many of our supposed thousand million Stars, perhaps a great majority of them, may be dark bodies" (Kevin, 1904)।

১৯০৬ সালে ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী Henri Poincaré কেলভিনের গবেষণা পত্রটি দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং একই বিষয়ের ওপর "The Milky Way and Theory of Gases" নামে একটি গবেষণপত্র প্রকাশ

করেন, যার শব্দগত অর্থ হলো "Dark Matter"। যদিও তিনি সেখানে কেলভিনের সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনিও স্বল্প পরিমাণ ডার্ক মেটারের অস্তিত্বের পক্ষে কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ডার্ক মেটারের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বিজ্ঞানী কেলভিনের হিসাবে ভুল হয়েছে। তিনি বলেছেন যেহেতু বিজ্ঞানী কেলভিন কেবল টেলিস্কোপের ডাটার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেহেতু বলা যায় ডার্ক মেটারের কোনো অস্তিত্ব নেই। মহাবিশ্বের গ্যাসীয় উপাদানের অস্তিত্ব এবং অদৃশ্য মহাজাগতিক বস্তুরাজিকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে শনাক্ত করা যায় না। তাই ঐ উপাদানদ্বয়ের মাধ্যমে মহাবিশ্বে শক্তি ও ভরের অসাম্যতার একটা সমাধান হতে পারে। অবশ্য তিনি নিজের সিদ্ধান্তকেও প্রকল্প বলেছেন। উপসংহারে তিনি বলেছেন "But how shall we reconcile that with what we have said above about the absence of dark matter in considerable proportion? ….. I content myself with pointing out the difficulty without pretending to solve it; I will close then with a great interrogation point. The more so as it is interesting to states problems even when the solution of them seems very far distant?" (Poincare, 1906)।

ডার্ক মেটারের অস্তিত্বের প্রশ্নে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাটি করেন হল্যান্ডের বিজ্ঞানী Jacobus Kapteyn, ১৯২২ সালে। তিনিও এখানে ডার্ক মেটারের অস্তিত্বের ভবিষ্যৎবাণী করেন। তিনি "First attempt at a theory of the arrangement and motion of the sidereal system" প্রবন্ধের Abstract এ লিখেছেন "It is incidentally suggested that when the theory is perfected it may be possible to determine the amount of dark matter from its gravitational effect." তিনিই প্রথম এই বস্তু এবং শক্তির শনাক্তকরণে Gravitational effect পদ্ধতি প্রস্তাব করেন (Kapetyn, 2022)।

১৯৩০ সালে সুইডেনের বিজ্ঞানী Kunt Lundmark গাণিতিক পদ্ধতিতে হিসাব করে বলেন এই মহাবিশ্বের পরিদৃশ্যমান উপাদানের চেয়ে অদৃশ্য উপাদানের পরিমাণ অনেক বেশি। তিনি তাঁর গবেষণায় পাঁচটি গ্যালাক্সির সর্বোচ্চ ঔজ্জ্বল্য থেকে তাদের ভর ও বিকিরণের হার নির্ণয় করেন। তিনি যে নক্ষত্রগুলির ঔজ্জ্বল্য কিছুক্ষণের জন্য আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পায় (Novae) সেগুলিকে নির্বাচন করেছিলেন। এখানে তিনি ভর ও বিকিরণের হারের মধ্যে একটা বিশাল পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করেন। এই তথ্য-উপাত্তগুলির প্রেক্ষাপটে তিনি বলেন, মহাকাশের জ্যোতিপদার্থ সিস্টেমগুলিতে (Astrophysics) একটা বিশাল পরিমাণ অদৃশ্যবস্তুর অস্তিত্ব আছে (Bertone and Hopper, 2016)।

১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী Jan Oort Doppler Shifts প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডার্ক মেটারের অস্তিত্বের পর্যবেক্ষণগত প্রমাণ করার সম্ভাবনার ইংগিত পান। এখানে তিনি তারাগুলির বর্ণালি পরীক্ষা করে দেখেন তারাগুলির যে গতিতে চলার কথা, তার চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে চলছে। তিনি আরো বলেন গ্যালাক্সিগুলিতে অবশ্যই অদৃশ্য ভরের অস্তিত্ব আছে, যেগুলির কারণে তারাগুলি সংঘবদ্ধভাবে থাকতে পারে (NASA, 2005)।

তারপরই, ১৯৩৩ সালে এই প্রশ্নের ওপর মাইলস্টোন গবেষণাটি করেন ক্যালটেকের বিজ্ঞানী Fritz Zwicky। তিনিই প্রথম পরোক্ষ পর্যবেক্ষণগত পরীক্ষার মাধ্যমে ডার্ক মেটার এবং এনার্জীর ওপর আধুনিক গবেষণার সুত্রপাত করেন; এবং তাঁরই প্রদর্শিত ধারায় পরবর্তী বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন।

Hubble এবং Humason ১৯৩১ সালে Red Shifts প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যালাক্সির ক্লস্টারের আপাত বেগ (Apparent Velocities) নির্ণয় করেন; সেখানে তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন কমা ক্লস্টারের আটটি গ্যালাক্সির আপাত বেগের ডাটায় গড়মিল (Discrepancy) আছে। এই পরিমাণটি ছিল 1000km/s। বিজ্ঞানী হাবল এবং হুমাসন এর ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

ৎসুয়িকি ১৯৩৩ সালে হাবল এবং হুমাসন কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন গ্যালাক্সির রত্তিম সরনের ডাটাগুলি অধ্যয়ন করেন এবং একটা সমাধান প্রস্তাব করেন। সেখানে তিনি তাঁদের পরিমাপে একটি বিরাট অসংগতি লক্ষ্য করেন। তিনি তাপগতিবিদ্যার (Thermodynamics, QCD) ভিরিয়াল থিউরেম এর মাধ্যমে কমা ক্লস্টারের আটটি গ্যালাক্সির ভর-বেগ নির্ণয় করেন এবং লক্ষ্য করেন, সেখানে বস্তুগত সমস্টির তুলনায় অনেক বেশি ভর-বেগ আছে এবং এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিক অণুসিদ্ধান্ত হলো, নিশ্চয় এখানে আরো প্রচুর পরিমাণে অদৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব আছে! এখানে তিনি সিদ্ধান্তে বলেন "If this would be confirmed we would get the surprising result that dark matter is present in much greater amount than luminous matter। ৎসুয়িকি ১৯৩৭ সালে এই বিষয়ের উপরই আরেকটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন এবং আরো পরিশিলিত ও উন্নত ডাটা উপস্থাপন করেন (Bertone and Hopper, 2016)।

ৎসুয়িকির গবেষণাটির পর এই বিষয়ের ওপর গবেষণা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। তবে ডার্ক মেটার এবং এনার্জীর ওপর গবেষণা ষাটের দশক থেকে আবার সরব হয়ে ওঠে। তার দুটি কারণ হলো- প্রথমত এই সময় এই বিষয়ের ওপর কাজ করার জন্য বেশ কিছু নতুন প্রযুক্তি তৈরি হয়। দ্বিতীয়ত এর কিছুদিন আগেই বৈজ্ঞানিক বিশ্বতত্ত্ব (Scientific Cosmology) প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় এবং অনেক কণাপদার্থবিদ্যা বিজ্ঞানী, জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানী ও বিশ্বতত্ত্ববিদরা এই বিষয়ের ওপর কাজ করার জন্য এগিয়ে আসেন। ষাট থেকে নব্বুই এর দশকের মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত উঁচুদরের (Groundbreaking) গবেষণা প্রকাশিত হয় যেগুলির ওপর নির্ভর করেই মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর ওপর গবেষণা বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার সিদ্ধান্তগুলি তুলে ধরা হলো:

১) Arrigo Finzi ১৯৬৩ সালে তাঁর "On the validity of Newton's law at a long distance" গবেষণাপত্রে বলেন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সুত্রে বলা হয়েছে, কোনো বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষমতা দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে কমতে থাকে। তিনি এখানে, তাঁর গবেষনা পত্রে দেখান যে গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সিগুলির ক্লস্টারের বাইরের দিকে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষমতা ভেতরের দিকের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তিনি সেই সময় পর্যন্ত ডার্ক মেটার "ব্যারিয়নিক উপাদান দ্বারা গঠিত" শিরোনামের সমস্ত গবেষণাপত্রগুলি প্রত্যাখ্যান করেন। এখানে তাঁর যুক্তি ছিল ডার্ক মেটার ব্যারিয়নিক উপাদান দ্বারা তৈরি হলে সেগুলি নিউটনের সুত্র অনুযায়ী গতিশীল হওয়ার কথা। তাহলে মহাকর্ষীয় বলের তারতম্য হতো না। এখানে তাঁর প্রস্তাব ছিল মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর ওপর গবেষণা করার জন্য নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়মকে বদল করতে হবে। তৎকালীন বিজ্ঞানীরা তাঁর এই শক্তিশালী গবেষণাপত্রটির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেন নি। "Despite the highly original and prescient nature of Finzi's work, it was largely ignored by the scientific community, …… the very bold nature of Finyi's conclusions may have been difficult for many of his colleagues to accept, or even seriously consider." (Bertone and Hopper, 2016)।

২) বিশ্বতত্ত্বে নিউট্রিনোর ভূমিকার ওপর প্রথম শক্তিশালী গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। গবেষণাটি করেন Gershtein ও Zeldovich। ষাটের দশকে বিজ্ঞানী জালদোভিচ ছিলেন মাত্র কয়েকজন কণাপদার্থবিদের মধ্যে একজন, যিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্বতত্ত্বকেও কণাপদার্থবিদ্যার প্রেক্ষাপট থেকে অনুসন্ধান করেছিলেন। মহাবিস্ফোরনের সামান্য পর, কী পরিমাণ নিউট্রিনো উৎপন্ন হয়েছিল, কত তাপমাত্রায় সেগুলি নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের মাধ্যমে ধ্বংস হয় এবং কি পরিমাণ নিউট্রিনো বেঁচে গিয়েছিল (Thermal Relic), তার ওপর তাঁরা অনুসন্ধান করেন। এখানে তাঁরা নিউট্রিনোর ভর নির্ণয় করেন এবং সেই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে মহাবিশ্বের সংকোচন ও প্রসারণের ওপর ভবিষ্যৎবাণী করেন। তাঁদের এই কাজটির মধ্যেই ছিল কালোবস্তু ও WIMPs উপাদানগুলির ওপর গবেষণার আদি বীজ। এর পরপরই সত্তুর এবং আশির দশকে এই নির্দেশনায় প্রচুর গবেষনা পত্র প্রকাশিত হয়। আশির দশকে বিজ্ঞানী জালদভিচ এবং তাঁর গবেষকদল প্রথম নিউট্রিনোকে ডার্ক মেটারের আদি উপাদান হিসেবে প্রস্তাব করেন (Bertone and Hopper, 2016)।

৩) সত্তুরের দশকের শুরুর দিকে আরেকটি যুগান্তকারী গবেষণা করেন বিজ্ঞানী Vera Robin, William Kent Ford, এবং Norbert Tonnard। তাঁরাই গ্যালাক্সিগুলির বৃত্তীয় গতি এবং শঙ্খিল (Spiral) গতির কার্ভগুলির তথ্য-উপাত্তের বিচার-বিশ্লেষণ করে মহাবিশ্বে বিশাল পরিমাণ মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর শনাক্ত করণের নিমিত্তে পর্যবেক্ষণগত ভিত্তি গড়ে তোলেন। তাঁরা পর্যবেক্ষণগতভাবে প্রদর্শন করেন, শঙ্খিল গ্যালাক্সিগুলির কেন্দ্র থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পরও বৃত্তীয় গতি মোটামুটি একই থাকে বা বাড়তে থাকে (এর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ছিল কোনো বস্তুর কেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্ব যতই বাড়তে থাকে মহাকর্ষীয় আর্কষণ ততই দুর্বল হতে থাকে)। যেমন গ্যালাক্সিগুলির প্রান্তবর্তী এলাকাতেও কিছু কিছু তারা থাকে, যাদের গতি-বেগ কম-বেশি একই থাকে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, গ্যালাক্সির ঐ নির্দিষ্ট এলাকার বাইরেও প্রচুর ডার্ক মেটার আছে এবং সম্ভবত তা গ্যালাক্সিটির চারিপার্শ্বে একটা উজ্জ্বল বলয় (Halo) সৃষ্টি করে (AMNH, 2000)।

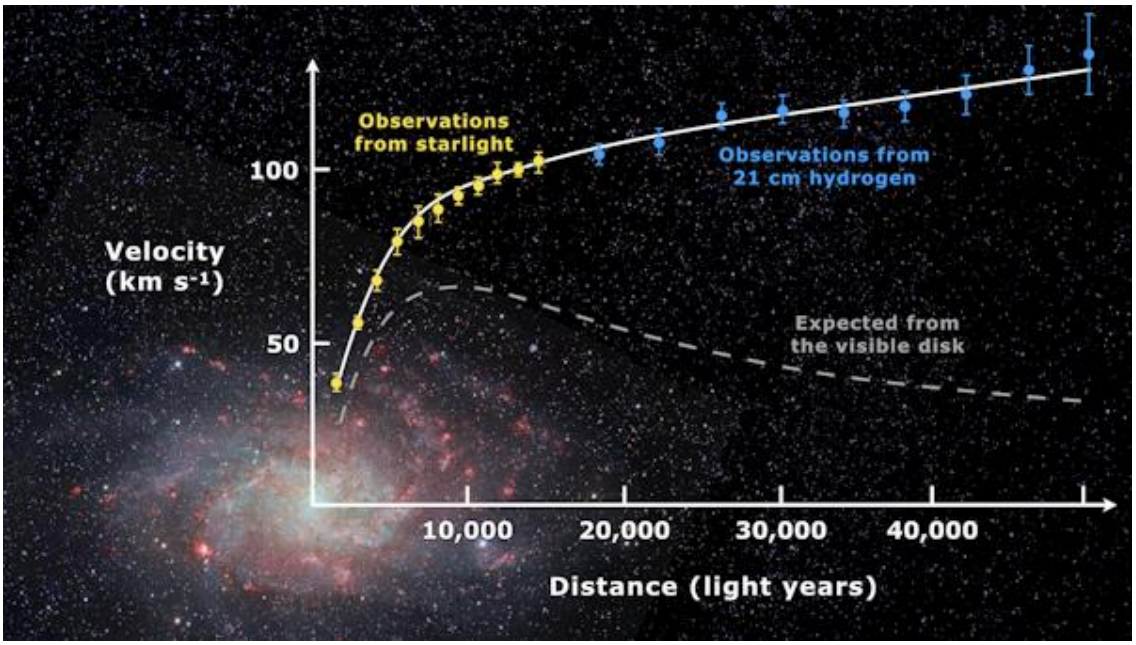

চিত্র ৩: The rotation curve of a spiral galaxy (Messier 33), is depicted by yellow and blue points along with error bars. A predicted curve shows the distribution of visible matter, represented by the gray line. Data and model predictions originate from Corbelli and Salucci (2000). The difference between these curves suggests the presence of a dark matter halo surrounding the galaxy (Credit: Leo, 2018)।

৪) ১৯৭৪ সালে তিন ইস্তোনিয়ার বিজ্ঞানী Jaan Einasto, Ants Kaasik, এবং Enn Saar এর গবেষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম ছিল "Dynamic evidence on massive coronas of galaxies" এখানে তাঁরা কোনো একটি গ্যালাক্সির সম্পূর্ণ ভর এবং তার ভেতরের তারাগুলির ভর পৃথক পৃথকভাবে নির্ণয় করেন। তাদের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় গ্যালাক্সির সামগ্রিক ভর পৃথক পৃথকভাবে নির্ণীত তারাগুলির ভরের সমস্টির চেয়ে অনেক বেশি। এই পার্থক্যকে তারা "Corona" বলে আখ্যায়িত করেন। আর এখান থেকেই ৎসুয়িকির "Missing mass" তত্ত্বের তাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় (Bertone and Hopper, 2016)।

৫) ঐ বছরই আরেকটি গবেষণাপত্র "The size and mass of galaxies, and mass of the universe" প্রকাশিত হয় এবং এর গবেষকত্রয় ছিলেন Jerry Ostriken, Jim Peebles, ও Amos Yahil। এখানে তারা অন্য দুটি গবেষণাপত্রের তথ্য-উপাত্ত গবেষণা করে উপর্যুক্ত গবেষণাটির মতো একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, গ্যলাক্সির বাইরের দিকের অংশে ডার্ক এনার্জীর পরিমাণ অনেক বেশি এবং গ্যালাক্সির বাইরের দিকের অংশে বিশাল পরিমাণ ডার্ক মেটার আছে (Bertone and Hopper, 2016)।

৬) পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্রটি ছিল বিজ্ঞানী Sandra Faber এবং John Gallagher কৃত। তাঁদের গবেষণাপত্রটির শিরোনাম ছিল "Masses and mass-to-light ratios of galaxies" এখানে তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল মহাবিশ্বের এই "অদৃশ্য ভর" অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ক্রমশ আরো শক্তিশালী হচ্ছে। সুতরাং

এই মহাবিশ্ব জুড়ে বিশাল পরিমাণ ডার্ক মেটার ছড়িয়ে আছে। এই গবেষণাপত্রে তাঁরা 'Corona' এবং 'Halo' শব্দদ্বয়ের বদলে 'Massive envelope' ধারনাটি ব্যবহার করেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত থেকেই বিশ্বতত্ত্ববিদ এবং জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে কণাপদার্থবিদরাও এই বিষয়টির ওপর গবেষণা শুরু করে (Faber-Gallagher, 1978)।

৭) ১৯৭৭ সালের Peccei-Quin তত্ত্বটিও এই গবেষণার ক্রমধারায় খুবই গুরুত্বপুর্ন। যদিও তাঁরা গবেষনাটি করেছিলেন QCD এর Strong CP সমস্যার সমাধানের জন্য। এখানেই তাঁরা প্রাকল্পিক কণা একসিয়নকে ডার্ক মেটারের সম্ভাব্য আদি কণা হিসেবে প্রস্তাব করেন। এই প্রাকল্পিক কণাটিকে ঠান্ডা ডার্ক মেটারের আদি সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত হয়। বিজ্ঞানী উইলচেক এই প্রাকল্পিক কণাটির একসিয়ন নামকরণ করেন (Wikipedia, 2023)।

৮) আশির দশকের মধ্যবর্তী সময়ে মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর ওপর গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রথম Numerical Simulation পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু করেন। এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রসারমান মহাবিশ্বের মহাকর্ষীয় শক্তির ক্ষেত্রে কী পরিমাণ ডার্ক মেটার থাকতে পারে, তার একটা গাণিতিক পরিমাপ সম্ভব এবং মহাবিশ্বের অবকাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের প্রাকল্পিক ডার্ক মেটারের ভূমিকা ও অংশগ্রহণের একটা প্রাকল্পিক ব্যাখ্যা তৈরি করা যায়। এই Numerical Simulation পদ্ধতির মাধ্যমে ডার্ক মেটারের উপাদান-প্রার্থী কোনো নির্দিষ্ট কণার আদি চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করা যায়। যেমন- এগুলি মহাবিশ্বের পরিগঠনের সময় কি উত্তপ্ত ছিল, না ঠান্ডা চরিত্রের ছিল।

স্টান্ডার্ড মডেলে নিউট্রিনোগুলি অত্যন্ত হালকা Thermal relics - যেগুলি আদি মহাবিশ্ব থেকে তৈরি হয়েছিল এবং আপেক্ষিক গতি (Velocity) সম্পন্ন। সুতরাং এগুলিকে গরম ডার্ক মেটারের (Hot dark Matter) উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। Numerical simulation পদ্ধতিতে দেখা যায়, মহাবিষ্ফোরণের পরপরই (মহাবিষ্ফোরণের $১০^{-৩৬}$ সেকেন্ডে) মহাবিশ্ব একটা সময় পর্যন্ত প্রচন্ড দ্রুত গতিতে প্রসারিত হতে থাকে (Inflationary universe) এবং মহাবিশ্বের একটা বিশাল অবকাঠামো তৈরি হয়। পরবর্তিতে তাপমাত্রা ক্রমশ কমে যাওয়ার কারণে মহাবিশ্বের প্রসারণের গতির হার ক্রমশ কমতে থাকে। এখানে মহাবিশ্বের পরিগঠনের প্রক্রিয়াটি বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্রের দিকে ("Top-down") ধাবিত। অন্যদিকে ঠান্ডা ডার্ক মেটার উপাদানগুলি মহাবিশ্বের পরিগঠনে বিপরীত প্রক্রিয়াটি ("Bottom-up") অনুসরণ করে।

প্রথম দিকের এই সিমুলেশনগুলি থেকে এটা বিজ্ঞানীরা ধারনা করতে থাকেন, ঠান্ডা এবং গরম ডার্ক মেটার দ্বারা মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অবকাঠামো তৈরি হয়। অবশ্য পররর্তীতে বিজ্ঞানীরা সিমুলেশনের পরীক্ষণের ফলাফলগুলির সাথে গ্যালাক্সিগুলির ওপর গবেষণার তথ্য-উপাত্তের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেন স্টান্ডার্ড মডেলের নিউট্রিনো অথবা অন্য যেকোনো গরম আদি কণাকে ডার্ক মেটারের শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত করা যায় না।

১৯৮৩ সালে Simon White, Carlos Frenk এবং Marc Davis তাদের গবেষনা পত্রে বলেন "We find (the coherence length) to be too large to be consistent with the observed clustering scale of galaxies ……. The conventional neutrino- dominated picture appears to be ruled out." (Bertone and Hopper, 2016)

আশির দশকের আরো অনেকগুলি গবেষণাপত্রের প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত পৌঁছেন যে, নিউট্রিনো ডার্ক মেটারের আদি উপাদান হতে পারে না। স্ট্যান্ডার্ড মডেলের নিউট্রিনো ডার্ক মেটারের পরিগঠনে অনেক হালকা এবং গরম (Light & Hot)। কিন্তু কতিপয় বিজ্ঞানী ডার্ক মেটারের তালিকা থেকে নিউট্রিনোকে এখনো বাদ দেননি। কারণ নিউট্রিনোর আরো তিনটি ভেরিয়েশন আছে। তাছাড়া SUSY (SUperSYmetry) তত্ত্বের প্রাকল্পিক কণা স্টেরাইল নিউট্রিনোস, নিউট্রালিনোস এই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত।

৯) ১৯৯৩ সালে Dodelson এবং Lawrence তাঁদের গবেষণাপত্রে এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে একটি খুব সহজ প্রকল্প প্রস্তাব করেন; তাহলো- হয়ত আরেকটি নিউট্রিনো শ্রেণি আছে, যেগুলি প্রচলিত নিউট্রিনোগুলির মতো দুর্বল বলের সাথে প্রতিক্রিয়া করে না, যা আমরা স্ট্যান্ডার্ড মডেলে দেখতে পাই। হতে পারে এই নিউট্রিনো শ্রেণিটি আদি মহাবিশ্বেই সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা আরো বলেন এই অজানা নিউট্রিনো শ্রেণিটির স্পন্দন (Oscillation) থেকে হয়ত ডার্ক মেটারের উপাদান উৎপন্ন হয়। তবে সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, নিউট্রিনো ডার্ক মেটারের আদি উপাদান হতে পারে না (Bertone and Hopper, 2016)।

এখন পরবর্তী গবেষণাগুলির আলোচনার আগে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে এখানে একটা প্রাথমিক পরিচিতি জরুরি। এগুলি হলো-

- বিজ্ঞানীদের গবেষণার এলাকা
- গবেষণার মাধ্যম ও পদ্ধতি

MACHOs এবং WIMPs

ডার্ক মেটারকে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করার নিমিত্তে বিজ্ঞানীরা এই মহাবিশ্বের বস্তুরাজিকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে নিয়েছেন। তাহলো- বৃহতের জগতে MACHOs (Massive Compact Halo Object) এবং ক্ষুদ্রত্বের জগতে WIMPs (Weakly Interacting Massive Particle)। তাছাড়া, সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞানীরা আরো কিছু প্রকল্প প্রস্তাব করেছেন যেমন- SIMPs (Strong Interaction Massive Particles), Hidden Sektor প্রকল্প।

MACHOs: এই গ্রুপের বস্তুগুলি ছোটখাট তারা থেকে বিশাল কালোগহ্বরও হতে পারে। এগুলি আমাদের পরিচিত সাব এটমিক উপাদানগুলি দ্বারা তৈরি। যেমন- ইলেকট্রন, নিউট্রন, প্রোটন। MACHOs বস্তুগুলির আরো উদাহরণ হলো- নিউট্রন তারা, বিচ্ছিন্ন গ্রহগুলি বা Brown dwarf, White dwarf এবং খুবই ঝাপসা Red Dwarf। এগুলিকেও এই গ্রুপে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রস্তাব করেছেন। জ্যোর্তিপদার্থবিদ Kim Grist প্রথম এই MACHOs নামটি প্রস্তাব করেন ।

কালোগহ্বর বা নিউট্রন তারাগুলি কোনো বিশাল তারার সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষ। গড়পরতায় নিউট্রন তারাগুলির ভর সূর্যের তুলনায় ১,৪ থেকে ৩ গুণ বেশি হতে পারে। সুপারনোভার অবশিষ্ট আরেকটি অংশ হলো এক ধরনের গ্যাসের মেঘ এবং এই উপাদানগুলি অবশ্যই বস্তুগত অবশিষ্ট অংশ হিসেবে মহাবিশ্বের কোথাও অদৃশ্য (Hidden) অবস্থায় রয়ে যায়। MACHOs খুব সামান্য আলো বিকিরণ করে বা একেবারেই বিকিরণ করে না, আন্তঃনাক্ষত্রিক স্পেসের মধ্যে গতিশীল, কোনো গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে যুক্ত নয়। এগুলির মধ্যে যেহেতু কোনো ঔজ্জ্বল্য নেই, তাই এই ধরনের উপাদানগুলি শনাক্ত করা খুবই কঠিন। বিজ্ঞানীরা ধারনা করছেন এই ধরনের বৃহৎ মহাজাগতিক বস্তুগুলিতে ডার্ক মেটার থাকতে পারে (NASA, 2005)।

নিউট্রন তারাগুলি খুবই বিশাল আকৃতির হয় এবং এটির আশেপাশে যদি কোনো উজ্জ্বল মহাজাগতিক বস্তু না থাকে, তবে এগুলি অদৃশ্য (Dark) হয়ে উঠতে পারে। এগুলি যেহেতু সুপারনোভা থেকে তৈরি হয়, তাই এগুলি সাধারণ বস্তুর মতো নয়।

সাদা ডোআর্ফ (Dwarf) হলো কোনো নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষের কেন্দ্র, মূলত Electron-degenerate উপাদান দ্বারা গঠিত। এগুলি প্রচন্ড ঘন। এই ধরনের সূর্যের সমান ভরের কোনো একটি তারার আকার হবে পৃথিবীর সমান! এগুলি খুবই ক্ষীণপ্রভ এবং বিকিরিণের উৎস হলো থারমাল এনার্জীর (Thermal Energy) অবশিষ্টাংশ থেকে। সবচেয়ে কাছের সাদা ডোআর্ফ হলো Sirius B (চিত্র ৪), যেটি পৃথিবী থেকে ৮,৬ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত। এটি Sirius A এর একটি বাইনারি (Binary) তারা, ১৯১০সালে আবিষ্কৃত হয় এবং এটির নামকরণ করেন বিজ্ঞানী Willem Luyten (Griest, 1993)।

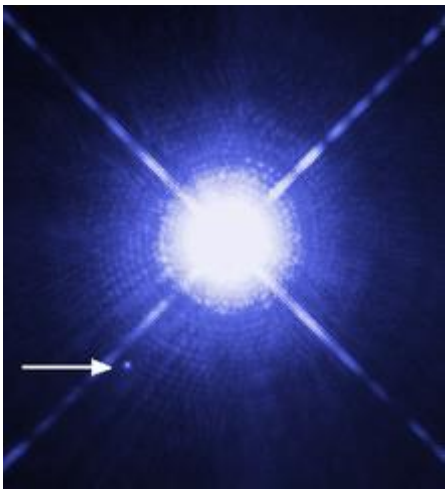

চিত্র ৪: Binary star Sirius A and Sirius B (pointed by an arrow) (Credit: Wikipedia Commons, 2006)।

ব্রাউন ডোআর্ফ তারাগুলির ভর সাধারণত সূর্যের ভরের চেয়ে ৮% কম হয়। এই কারণে যথেষ্ট পরিমাণ ভরের অভাবে, সেখানে কোনো আণবিক বিক্রিয়া ঘটে না, তাই কোনো আলো বিকিরণও করে

না। আমাদের গ্যালাক্সির উজ্জ্বল পরিমন্ডলে অবস্থিত ব্রাউন তারাগুলিকে GL বা ML (MicroLensing) পদ্ধতিতে শনাক্ত করা হয়। আইনস্টাইন প্রথম মহাবিশ্বের এই নিয়মটির অস্তিত্বের ভবিষ্যৎবাণী করেন। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিতে যে পরিমাণ ব্রাউন তারার সংখ্যা নির্ণয় করেছেন, তা ডার্ক মেটারের উপাদান হওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে না।

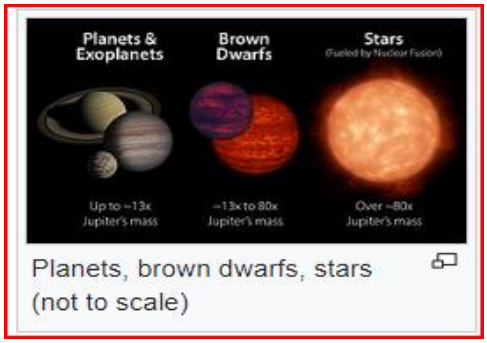

চিত্র ৫: Brown Dwarf (Credit: Wikipedia Commons, 2020)।

রেড ডোআর্ফ (Red Dwarf) হলো মহাকাশে সবচেয়ে ছোট (এগুলির ভর হলো সূর্যের ভরের মাত্র ৭.৫%) এবং ঠান্ডাতম (২০০০ kelvin) তারা। এই তারার সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হলো সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী Proxima Centauri তারাটি। খুবই ক্ষীনপ্রভার কারনে এদেরকে শনাক্ত করা খুবই কঠিন, খালি চোখে দেখা প্রায় অসম্ভব। বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেন আমাদের ছায়াপথের একটা বিশাল অংশ এবং Magellanic মেঘে এই ধরনের প্রচুর অদৃশ্য তারা রয়েছে (Wikipedia, 2024)।

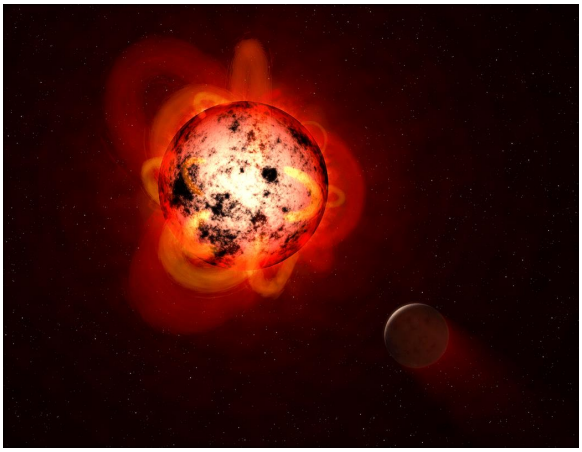

চিত্র ৬: Flaring Red Dwarf Star (Credit: NASA, 2017)।

MACHOs গুলি যখন কোনো উজ্জ্বল মহাজাগতিক বস্তুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন উজ্জ্বল বস্তুগুলির কারণে অনালোকিত MACHOs গুলি খুব অল্প সময়ের জন্য উজ্জ্বল বা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

অথবা তার উল্টোটিও ঘটে পারে, এটিকে বলা হয় Gravitational microlensing (ML)। এটি মহাবিশ্বের MACHOs বস্তুগুলিকে শনাক্ত করার আরেকটি পদ্ধতি। তবে MACHOs এর গতি-প্রকৃতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্য মতভেদ আছে। একদল বিজ্ঞানী বলেন MACHOs এর তথ্য-উপাত্ত থেকে ডার্ক মেটারের অস্তিত্বকে নির্ণয় করা যায় না। আবার আরেক দল বিজ্ঞানীরা ২০০০ সালে (MACHO Collaboration) বলেছেন, এই মহাবিশ্বে মাইক্রোলেন্সিং এর মাধ্যমে প্রচুর মহাজাগতিক বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে এবং সেখানে প্রায় ২০% ডার্ক মেটার থাকতে পারে (Alcock et al., 2000)।

EROS2 প্রকল্পের আর এক দল বিজ্ঞানী Red dwarf এবং White dwarf কে এই গ্রুপে সংযোজনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে মাইক্রোলেন্সিং শিফট (Shift) খুঁজে পাননি। সেখানে তারা উজ্জ্বল পরিমন্ডলগুলিতে (Halo) এই বস্তুদ্বয়ের ১% ভাগেরও কম ভর শনাক্ত করতে পেরেছেন, যেগুলি Red dwarf থেকে প্রসূত।

WIMPs: বিজ্ঞানীরা কিছু অনাবিষ্কৃত প্রাকল্পিক সাব এটমিক কণাকে ডার্ক মেটারের আদি উপাদান হিসেবে প্রস্তাব করেছেন, এই গ্রুপটিকেই বলা হয় WIMPs। WIMPs এর কোনো সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনো বিজ্ঞানীরা প্রণয়ন করেননি। তাই সাধারণভাবে বলা যায়, এগুলি কতগুলি নতুন ধরনের প্রাকল্পিক আদি কণা, যেগুলি শুধু মহাকর্ষীয় বলের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে; প্রকৃতির মৌলিক বলগুলির সাথে কোনো ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে না (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, যেমন নিউট্রিনো কণা দুর্বল বলের সাথে খুবই ক্ষীণ একটা বিক্রিয়া করে)। এগুলি স্ট্যান্ডার্ড মডেলের কোনো অংশ নয়, এবং দুর্বল বলের চেয়ে অনেক বেশি দুর্বলতর, কিন্তু অকল্পনীয় ক্ষুদ্রশক্তি সম্পন্ন।

এগুলি আমাদের পরিচিত ব্যরিয়নিক উপাদান দ্বারা তৈরি নয়। এগুলিকে "Weakly Interacting" বলা হয়, কারণ এগুলি কোনো রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছাড়াই যেকোনো সাধারণ উপাদানের ভেতর দিয়ে চলাচল করতে পারে। এগুলিকে "massive" বলা হয়, কারণ এই ধরনের কিছু প্রাকল্পিক কণার ভর ব্যরিয়নিক কণার চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে। যেমন নিউট্রালিনু একটি প্রোটনের চেয়ে ৩০ থেকে ৫০০০ হাজার গুণ বেশি ভারি হতে পারে। আর SUSY তত্ত্বের তড়িত নিরপেক্ষ কণাগুলির মধ্যে এটি হলো হালকাতম! এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, স্টেরাইল নিউট্রিনো, একসিয়ন এবং নিউট্রালিনু কণাগুলি, সবচেয়ে সম্ভাবনাময়, ডার্ক মেটারের আদি উপাদান হওয়ার (NASA, 2005)।

নিউট্রিনো আবিষ্কারের শুরুর দিকে বিজ্ঞানীদের ধারনা ছিল নিউট্রিনো কণা ভরশূন্য। ১৯৯৮ সালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে, নিউট্রিনোর খুব হালকা একটা ভর আছে। তাই অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন এই অতি ক্ষুদ্র ভরের কারণে এগুলির ডার্ক মেটারের আদি উপাদানের সম্ভাব্য প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম (Rajasekaran, 2016)।

একসিয়ন কণাকে প্রস্তাব করা হয় কোনো একটি নিউট্রনের "Electrical dipole" এর অনুপস্থিতিকে প্রমাণ করার জন্য। আর এই প্রক্রিয়ার ফলাফল কণাপদার্থবিদ্যা এবং জ্যোর্তিবিদ্যার জন্য খুব প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, একসিয়নেরও যথেষ্ট ভর নেই ডার্ক মেটারের সম্ভাব্য

প্রার্থী হওয়ার। আবার অনেক বিজ্ঞানী বলেন সম্ভবত বিগব্যাং থেকে প্রচুর পরিমাণে একসিয়ন কণা উৎপাদিত হয়েছিল। বর্তমানে একসিয়ন এর অস্তিত্বকে ল্যাব ছাড়া গ্যালাক্সির হ্যালো (Halo) এবং সূর্যের অভ্যন্তরেও সন্ধান করা হচ্ছে।

আর SUSY তত্ত্ব থেকে বিজ্ঞানীরা নিউট্রালিনুকে ডার্ক মেটারের আরেকটি সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে চিন্তা করছেন। নিউট্রিলিনু সাব এটমিক জগতের আপেক্ষিকতায় একটি অত্যন্ত ভারি কণা। বিজ্ঞানীরা ভূগর্ভের ল্যাব এবং মহাবিশ্ব- দুই পরিসরেই এই কণাটির সন্ধান করছেন।

এই প্রকল্পে বলা হয়েছে, আদি মহাবিশ্বে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের আদি কণাগুলির মতো এই ধরনের অনেক আদিকণা উৎপন্ন হয়েছিল (Thermal relics) এবং এগুলিই হলো ঠান্ডা ডার্ক মেটার (CDM, Cold Dark Matter)। ডার্ক মেটারগুলিকে পরীক্ষামূলকভাবে শনাক্ত করার জন্য আদি কণাগুলির মধ্যে সংঘর্ষগত কারণে যে তারা বিলীন (Anniliation) হয়ে যায় সেখানেও তারা অনুসন্ধান করেন। তাছাড়া গামা রে, নিউট্রিনো এবং নিকটবর্তী গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সিপুঞ্জের মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Ray) গুলিকেও এই গ্রুপে অন্তর্ভূক্ত করেন। এই কণাগুলিকে শনাক্ত করার জন্য WIMPs কণাগুলিকে কোনো কেন্দ্রীনের (Nuclei) সাথে সংঘর্ষ ঘটানো হয়; আবার ত্বরণ যন্ত্রগুলির (Colliders) মাধ্যমেও WIMPs কণাগুলিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

WIMPs গ্রুপের প্রাকল্পিক কণাগুলিকে বিজ্ঞানীরা আবার তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- উত্তপ্ত ডার্ক মেটার (Hot Dark Matter, HDM), গরম ডার্ক মেটার (Warm Dark Matter, WDM) এবং ঠান্ডা ডার্ক মেটার (Cold Dark Matter, CDM)।

উত্তপ্ত ডার্ক মেটার (HDM): এই প্রকল্পে বিজ্ঞানীরা তাপমাত্রার কোন সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রাগত সিমানাকে প্রস্তাব করেননি। এখানে তারা ঐ ধরনের অতি ক্ষুদ্র এবং অকল্পনীয় স্বল্প ভরযুক্ত কণাগুলিকে প্রস্তাব করেছেন, যেগুলির গতি প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি। স্ট্যান্ডার্ড মডেলের তিন ধরনের নিউট্রিনো কণাগুলি হলো এই গ্রুপের শক্তিশালী প্রার্থী। এই উপাদানগুলির অস্তিত্ব পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত; এগুলি তড়িত-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সাথে অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ করে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা নির্ণয় করেছেন, একটি নিউট্রিনোর ভর হলো একটি প্রোটনের এক বিলিয়ন ভাগের একভাগ, অর্থ্যাৎ 10^{-34}। যদিও নিউট্রিনোর ভর অতি সামান্য, নিউট্রিনোর শক্তি ঘনত্ব সমস্ত মহাবিশ্বে আলোর উপাদানের শক্তি ঘনত্বের ০.০৫% (Luminet, 2020)।

গরম ডার্ক মেটার (WDM) : এই প্রকল্পে আরেকটি আদি প্রাকল্পিক উপাদান ডার্ক মেটারের আদি উপাদান হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। তাহলো স্টেরাইল নিউট্রিনো (Strile Neutrino)। স্টেরাইল নিউট্রিনো সাধারণ নিউট্রিনোগুলির মতো দুর্বল বল, সবল বল বা তড়িত-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সাথে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে না, তাই এদেরকে শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এই কণাগুলির যেহেতু ভর আছে সেহেতু মহাকর্ষীয় শক্তির সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে।

এই প্রাকল্পিক কণাটি নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন প্রখ্যাত ইতালীয়ান বিজ্ঞানী এটোরে মাজোরানা (Ettore Majorana)।

স্টেরাইল নিউট্রিনোগুলির উদ্ভব হয় সাধারণ নিউট্রিনোগুলির বৃত্তীয় ও রৈখিক গতি (Helicity) তে অনিয়ম (Anomaly) জনিত কারণে। স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সাব এটমিক উপাদানগুলির একটি গতিশীল অবস্থা থাকে, এটাকেই চক্রন বলা হয়। কোনো একটি উপাদানের বৃত্তীয় ও রৈখিক গতি বাম অথবা ডান দিকে হতে পারে, যা নির্ভর করে ঘূর্ণন দিক-নির্দেশনার ওপর। যদিও স্ট্যান্ডার্ড মডেলের লেপটন বা কোয়ার্ক কণাগুলি ডান দিকে বা বাম দিকে অর্থাৎ উভয় দিকেই ঘুরতে পারে, কিন্তু নিউট্রিনোর ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত ডান দিক নির্দেশনায় ঘূর্ণনকে পর্যবেক্ষণ করা যায়নি। Minimal Supersymetry Standard Model (MSSM) এ ভুলভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল যে, সাধারণ নিউট্রিনোগুলির "শূন্য-স্থির-ভর" (Zero rest mass) আছে। কিন্তু ১৯৯৮ সালে নিউট্রিনোর স্পন্দন (Oscillation) চরিত্র আবিষ্কার হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা বাধ্য হন নিউট্রিনোতে ভর আরোপ করতে । স্টেরাইল নিউট্রিনোগুলিকেও এই ধরনের ভর ও কম্পন যুক্ত বলে বিজ্ঞানীরা প্রস্তাব করেন, যদি স্টেরাইল নিউট্রিনোগুলির ভর $<2.14*10^{-37}$kg –এর চেয়ে কম হয়, তবে এই কণাগুলি ডার্ক মেটারের আদি উপাদান হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে বলে বিজ্ঞানীরা ধারনা করেন (Luminet, 2020)।

অনেকগুলি পরীক্ষণের মাধ্যমে স্টেরাইল নিউট্রিনোকে শনাক্ত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে, কিন্তু তাদের সবগুলি ফলাফল পরস্পর বিরোধী। যেমন ২০১৬ সালে গবেষকরা Ice Cube Neutrino Observatory তে স্টেরাইল নিউট্রিনোকে শনাক্ত করার একটি প্রয়াস চালান। কিন্তু সেখানে তাঁরা স্টেরাইল নিউট্রিনোর সন্ধান পাননি। স্টেরাইল নিউট্রিনো হলো একটি প্রাকল্পিক সাব এটমিক কণা যেটি একমাত্র মহাকর্ষীয় বল ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে না এবং ডার্ক মেটারের আদি উপাদানের অন্যতম সম্ভাবনাময় প্রার্থী। তার দুই বছর পর বিজ্ঞানীরা Mini Boo Ne Collaboration পরিক্ষণে, নিউট্রিনোর ইস্পিত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ স্পন্দনের সন্ধান পান। স্টেরাইল নিউট্রিনোকে শনাক্ত করার এটি একটি আশাপ্রদ ইঙ্গিত।

ঠান্ডা কালোবস্তু (Cold Dark Matter, CDM): এই ধরনের আদি উপাদানগুলি HDM ও WDM কণাগুলির তুলনায় বড় এবং স্লথ গতি সম্পন্ন হয়। এই ধরনের অপরিচিত (Exotic) উপাদানগুলি উচ্চশক্তি পদার্থ বিদ্যায় (High energy physics) উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, যা স্ট্যান্ডার্ড মডেলের বাইরের বিষয়। এই ধরনের দুটি সম্ভাব্য উপাদান হলো এক্সিয়ন (Axions) এবং নিওট্রালিনোস (Neutralinos)। এক্সিয়ন প্রাকল্পিক কণাটির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ধারনা করেন এগুলি স্থায়ী (stable), তড়িত নিরপেক্ষ (electrically neutral) এবং অকল্পনীয় হালকা; তাদের ভর $১০^{-৩৯}$ কেজি থেকে $১০^{-৩৬}$ কেজি এর মধ্যে বলে বিজ্ঞানীরা ধারনা করেন। এই নির্দেশনায় CAST (CERN Axion Solar Telescope) এবং ADMX (The Axion Dark Matter eXperiment) নামে দুটি প্রজেক্টে এক্সিয়ন কণাকে শনাক্ত করার প্রয়াস চালানো হয়, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়।

অন্যদিকে সুপার সিমেট্রি তত্ত্ব নিউট্রালিনো (Neutralino) প্রাকল্পিক কণাকে ডার্ক মেটারের আদি উপাদান হিসেবে প্রস্তাব করেছে। CAST তত্ত্বে প্রতিটি আদি কণার একটি বিপরীত কণার অস্তিত্বের কথা ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, এগুলিকে বলে সুপার পার্টনার (Sparticles)। এগুলি তাদের পার্টনারের চেয়ে

ভারি হয়। SUSY তত্ত্ব থেকে ডার্ক মেটারের আদি উপাদান হিসেবে নিউট্রালিনোকেও হয়ত শনাক্ত করা যাবে, যেগুলি নন-ব্যরিয়ন ডার্ক মেটারের উপাদান হতে পারে। তড়িত নিরপেক্ষ কণা ফোটিনো (Photino) (ফোটনের সুপার পার্টনার), Zino (Zo boson) এবং Higgsine (Higgs Boson) কণার সমন্বয়ে নিউট্রালিনো অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় উৎপন্ন হয় এবং বিগব্যাং এর সময় প্রচুর নিউট্রিনো উৎপাদিত হয়েছিল।

এই প্রকল্প অনুসারে এই প্রাকল্পিক কণাগুলি যেহেতু স্থায়ী, সেহেতু মহাবিশ্বে এগুলি প্রচুর পরিমাণে থাকার কথা, যেগুলির ভর প্রোটনের চেয়ে একশ গুণ বেশি ($১০^{-২২}$ গ্রাম) হতে পারে। তাই এই তত্ত্বের প্রবক্তারা নিউট্রালিনোকে ডার্ক মেটারের আদি উপাদান হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা হিসেবে দেখেন।

কনাপদার্থবিদ্যার প্রেক্ষাপটে স্ট্যান্ডার্ড মডেলে যে সুপারসিমেট্রি প্রক্রিয়ায় গবেষণা করা হয়, তাকেও WIMPs কণা শনাক্ত করণে ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়া থেকে WIMPs কণার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন কণা উৎপন্ন হতে পারে বলে অনেক বিজ্ঞানী ধারনা করেন। এই সম্ভাবনাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় "WIMPs miracle"। এখান থেকে প্রসূত কোনো সুপার সিমেট্রিক সুপার পার্টনার কণা যদি স্থায়ী (Stable) হয় তবে তাও ডার্ক মেটারের আদি কণা হতে পারে (Jangman et al., 1995)।

অনেক বিজ্ঞানী বলছেন নিউট্রিনোর সুপার-পার্টনার Neutralino সবচেয়ে সম্বভবনাময় ডার্ক মেটারের আদি উপাদান। ২০১৩ সালের এক গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে, LHC এর মাধ্যমে সুপার সিমেট্রিকে শনাক্ত করনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে; তাই অনেক বিজ্ঞানী WIMPs গ্রুপ থেকে ডার্ক মেটারের আদি কণা আবিষ্কারে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন (Craig, 2014)।

অ্যান্টি ম্যাটার সাব এটমিক উপাদানগুলিকেও বিজ্ঞানীরা WIMPs এর অনুসন্ধানের গ্রুপে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

প্রতিবস্তু (Antimatter): WIMPs কণাগুলিকে শনাক্ত করার আরেকটি পরোক্ষ প্রাকল্পিক প্রস্তাব হলো প্রতিবস্তু। এই তত্ত্বে বলা হয় প্রতিটি বস্তুর একটি প্রতিবস্তু আছে, যেগুলির ভর একই কিন্তু বিপরীতধর্মী বা বিকর্ষণধর্মী। যেমন ইলেকট্রনের প্রতিবস্তু পজিট্রন, কোয়ার্ক-অ্যান্টিকোয়ার্ক, প্রোটন-অ্যান্টিপ্রোটন। প্রতিবস্তুগুলি এই অ্যান্টি উপাদানগুলি দ্বারা গঠিত। যখন কোনো বস্তু তার প্রতিবস্তুর সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে তখন তারা ধ্বংস (annihilate) হয়ে যায় এবং বিকিরণমূলক শক্তিতে পরিণত হয়। যখন বস্তু শক্তি থেকে উৎপন্ন হয় (যেমন- কণা-ত্বরণ যন্ত্রগুলিতে) তখন উপাদানগুলি বস্তু-জোড়া (particles pairs) এবং প্রতিবস্তু-জোড়াতে সমান পরিমাণে বিতরিত হয়। ১৯৯৬ সালে প্রথম CERN এর ত্বরণ-যন্ত্রে অ্যান্টি হাইড্রোজেন অণু তৈরি করা হয়। সাম্প্রতিক কালে CERN এর আলফা প্রজেক্টে বিজ্ঞানীরা (Alfa Collaboration) এক হাজার অ্যান্টি হাইড্রোজেন অণু তৈরি করতে সক্ষম হন এবং চুম্বক ক্ষেত্র (Magnetic Trap) তৈরি করে তাতে ঐ অ্যান্টি হাইড্রোজেন অণুগুলিকে কয়েক ঘণ্টা ধরে রাখতে ও সক্ষম হন (Baker et al., 2023)।

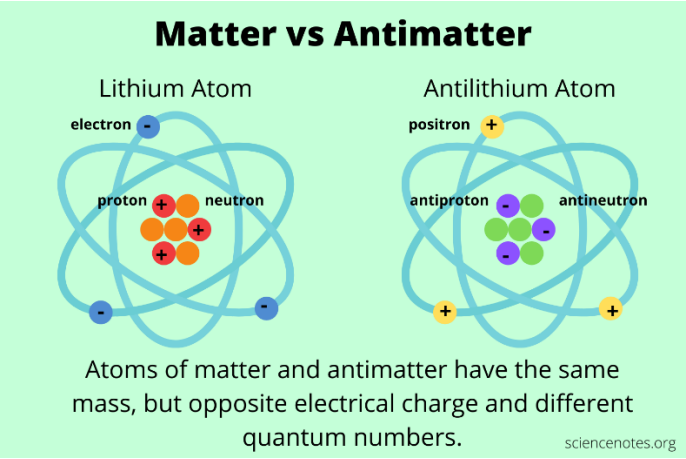

চিত্র ৭: Matter and antimatter atoms possess identical mass, yet their protons and electrons carry opposite charges (Credit: Helmenstine, 2024)।

যেহেতু উপর্যুক্ত কোনো মডেলই এই সমস্যার সমাধান দিতে পারছে না, সেহেতু বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রতিবস্তুতে বিকর্ষণধর্মী মহাকর্ষীয় বলের আরোপ করার প্রকল্প প্রস্তাব করেছেন। তবে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মনে করেন এই প্রকল্প সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এই প্রকল্পকে পরীক্ষা করে দেখা তুলনামূলকভাবে সহজতর। যেমন CERN এর আলফা প্রজেক্টের মধ্যে প্রতি-অণু তৈরি করে তাকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে স্থাপন করলেই আমরা তার প্রমাণ পেয়ে যাব। আর যদি এই প্রকল্পের প্রস্তাব সঠিক বলে প্রমাণিত হয় তবে স্ট্যান্ডার্ড মডেল ভুল বলে প্রমাণিত হবে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটে যাবে এক মহা বিপ্লব। লেখক এখানে বলেছেন, ঐ পরীক্ষায় সম্ভবত প্রমাণিত হবে ডার্ক মেটার এবং প্রতিবস্তুর ঘনত্বের ক্ষেত্রে প্রতিবস্তুর আদৌ কোনো ভূমিকা নেই (Luminet, 2020)।

SIMPs: ২০১৭ সালে ডার্ক মেটারের আদি উপাদানের ওপর একটি ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এখানে বলা হয়েছে MACHOs প্রকল্প বর্তমানে মৃত, WIMPs প্রকল্প সম্ভাবনাহীন এবং এই প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানীরা ডার্ক মেটারের আদি উপাদানকে অনুসন্ধান করার আরেকটি প্লাটফর্ম প্রস্তাব করেছেন, তাহলো SIMPs (Strong Interacting Massive Particles) ।

আর SIMPs প্রকল্পে প্রস্তাব করা হয়েছে, এই কণাগুলি নিজেদের মধ্যে সবলভাবে বিক্রিয়া করে এবং সাধারণ কণাগুলির সাথে অত্যন্ত ক্ষীণভাবে বিক্রিয়া করে। এখানে বিজ্ঞানী মুরায়ামা (Murayama) SIMPs কণাগুলিকে কোয়ার্কগুলির একত্রিত হওয়ার প্রক্রিয়া থেকে তাদের অস্তিত্ব অনুমান করেছেন। স্ট্যান্ডার্ড মডেলের আদি কণাগুলি, যেমন নিউট্রন বা প্রোটন তৈরি হয় নির্দিষ্ট সংখ্যক কোয়ার্কের সমন্বয়ে। অন্যদিকে SIMPs কণাগুলি পায়ন (Pion) কণার মতো একটি কোয়ার্ক এবং একটি অ্যান্টি কোয়ার্কের সমন্বয়ে দুটি কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। এখানে এই কণাগুলির সংখ্যা পরিমাণে বেশি উৎপাদিত হয়; তা থেকে বিজ্ঞানী মুরায়ামা বলেন, যদিও এগুলি খুব দুর্বলভাবে সাধারণ উপাদানের সাথে আন্তঃক্রিয়া করে, তাই এটা খুবই স্বাভাবিক এগুলি ব্যারিয়ন কণার মত একত্রিত (Merging) বা ক্ষয় (Decaying) না হয়ে

মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সাধারণ বস্তুতে তাদের একটা নিশানা (Fingerprint) থেকে যাওয়াটা যৌক্তিক (Sanders, 2017)।

থারমাল রেলিক্স (Thermal Relics): বিজ্ঞানীরা বলেন আদি মহাবিশ্ব, বিগব্যাং এর পর যখন ক্রমশ ঠান্ডা হচ্ছিল তখন এক পর্যায়ে আদি ক্ষুদ্র কণাগুলির উদ্ভব হতে থাকে। এগুলিকে বলা হয় তপ্ত-অবশিষ্টাংশ (Thermal Relics)। এই ঠান্ডা হওয়ার একটা বিশেষ সময়গত পর্যায়ে কিছু তাপ-নিরপেক্ষ আদি কণার উদ্ভব হয়েছিল। এই সময়গত মুহূর্তটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় "Phase Transition"।

এই তপ্ত ও তাপ-নিরপেক্ষ উদ্ভূত কণাগুলির মধ্যে মূল পার্থক্যগুলি হলো, এগুলির উৎপাদনের পরিমাণ ও ভরের মধ্যে পার্থক্য ছিল এবং জোড়াবদ্ধতাও (Coupling) ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। এই পার্থক্যগুলি ডার্ক মেটারকে শনাক্ত করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- WIMPs কণাগুলি তাপশক্তি থেকে উদ্ভূত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা ধারনা করেন ডার্ক মেটারের অন্যতম আদি উপাদান প্রার্থী একসিয়ন কণাগুলি তাপ-নিরপেক্ষ (Non-Thermal) প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা বলেন, আদিম মহাবিশ্বের ঐ অতি উচ্চ তাপমাত্রায় যখন আদি উপাদানগুলি তৈরি হচ্ছিল, তখন তারা একটা সাম্য অবস্থায় (Equilibrium) ছিল এবং উৎপাদিত আদি উপাদানগুলির ঘনত্ব এবং ফোটনের ঘনত্ব প্রায় একই পরিমাণ ছিল। সেই সময়টায় মহাবিশ্ব যখন ক্রমশ ঠান্ডা হচ্ছিল, তখন সেখানে WIMPs এর পরিমাণ এবং ফোটনের সংখ্যায় আনুপাতিক হারে পরিবর্তন হচ্ছিল। অর্থ্যাৎ তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার কারণে আদি কণাগুলি থেকে ফোটন নির্গত হচ্ছিল এবং এই কারণে WIMPs এর পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে এবং ফোটনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং WIMPs কণাগুলি তাদের তাপমাত্রার ক্রান্তিবিন্দুতে (Critical Point) পৌঁছানো পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে (ফোটন নির্গমনের কারণে তাদের তাপমাত্রা কমছিল)। WIMPs কণাগুলির তাপমাত্রা যখন ক্রান্তি বিন্দুর নিচে চলে আসে, তখন তারা ক্রমশ কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং প্রসারণের বর্হিদেশে অবস্থান নেয় এবং WIMPs কণাগুলির ঘনত্ব চক্রবৃদ্ধি (Exponentially) হারে কমতে থাকে। কারণ তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে তাদের ধ্বংসায়ন (Annihilation) হতে থাকবে এবং তাদের সংখ্যা কমতে থাকবে।

যদি শুরুতে প্রতিষ্ঠিত ঐ সাম্য অবস্থা এখন পর্যন্ত থেকে থাকে, তবে তাদের ঘনত্ব অনেক কমে যাওয়ার কথা। তাপমাত্রা হ্রাসের এই প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ সময়ক্ষণে তাপমাত্রা এত নিচে নেমে যাওয়ার কথা যে তখন একটি WIMPs এর পক্ষে আরেকটি WIMPs খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে। সুতরাং তাদের ধ্বংসায়ন বন্ধ হয়ে যাবে। এ সময় অবশিষ্ট WIMPs কণাগুলি স্থায়ী হয়ে যাবে। এখানে প্রসংগক্রমে উল্লেখ করে রাখা জরুরি যে যদি কোন একটি WIMPs কণা স্থায়ী (Stable) হয়, সেটা ডার্ক মেটারের আদি উপাদান হতে পারে।

এই অবস্থায় ঐ সময়কার কিছু WIMPs কণার তাপজনিত স্বল্পতার কারণে জমাট বেঁধে (Freeze-out) যাওয়ার কথা এবং সেগুলির একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এখনো মহাবিশ্বে অস্তিত্বশীল থাকার কথা। বোলৎম্যানের সমিকরণের মাধ্যমে তা সঠিকভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। এগুলিই হলো প্রাকল্পিক WIMPs কণা।

সাব এটমিক জগতে, স্ট্যান্ডার্ড মডেলের বেশ কিছু সমস্যা কণা পদার্থবিদ্যার দুর্বল তড়িৎ-চুম্বকীয় বলতত্ত্বের মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে, যা সুপারসিমেট্রি তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, WIMPs কণার দ্বারা ডার্ক মেটারের আদি উপাদান তৈরি হয়ে থাকতে পারে। কারণ যেকোনো আদি কণার যখন ধ্বংশায়ন ঘটে তখন সেখান থেকে ডার্ক মেটারের আদি উপাদানকে শনাক্ত করার উজ্জ্বল সম্ভবনা রয়েছে। এখানে বিজ্ঞানীদের যুক্তি হলো যদি ডার্ক মেটারের আদি উপাদান তাপজনিত উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে তবে, সেগুলির দুর্বল বলের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করা যৌক্তিক। এবং এই অবস্থা থেকেই বিজ্ঞানীরা আশা করছেন একসময় LEP, CERN বা ফার্মি ল্যাবের CDF ত্বরণযন্ত্রের মাধ্যমে তা প্রমাণ করা সম্ভব হবে (Griest, 1996)।

হিডেন সেক্টর প্রকল্প (Hidden Sector Project): ২০০৬ সালের ঐ গবেষণা পত্রে প্রফেসর জুরেক এবং তাঁর সহকর্মীরা বলেন ডার্ক মেটার কোনো অচেনা এলাকার (Clavin, 2020) অংশ। এগুলির স্ট্যান্ডার্ড মডেলের আদি উপাদানগুলির মতোই (ফোটন, ইলেকট্রন, কোয়ার্ক ইত্যাদি) নিজস্ব ও গতিশীল আদি উপাদান আছে। আমাদের পরিচিত মহাবিশ্বের বিপরীতে এই অচেনা এলাকার উপাদানগুলি কোনো ডার্ক মহাবিশ্বে (Dark Universe) অবস্থান করছে। তাঁরা আরো বলেন, এই অচেনা জগতের ডার্ক মেটারের উপাদানগুলি নিজেদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকে এবং কখনো কখনো কোনো প্রাকল্পিক বহনকারী কণার (Messenger particle) মাধ্যমে আমাদের এই পরিচিত মহাবিশ্বে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু এগুলি WIMPs কণার সম্পুর্ণ বিপরীত- এখানে বলা হয়েছে এই কণাগুলি আমাদের মহাবিশ্বের দুর্বল বলের (Weak interacting force) সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয় এবং তাদের মধ্যে ভারি কণার বিনিময় হয়। তাঁরা বলেন WIMPs কণাগুলির তুলনায় এই অচেনা জগতের কণাগুলির ভর ও শক্তি অনেক কম হবে। এখানে প্রফেসর জুরেক বলেন, "We are moving to a new frontier of lighter dark matter, At first we call these particles hidden valleys because the idea was that you would climb a mountain pass and look down to very low energy particles."

এই ধরনের Hidden-sector dark matter এর কতিপয় প্রকল্প:

- Dark Photon: শক্তি বহনকারী প্রাকল্পিক কণা যেগুলি ডার্ক মেটারের সাথে যুক্ত থাকতে পারে।
- Fifth Force: প্রকৃতিতে একটি মৌলিক পঞ্চম শক্তির অস্তিত্ব আছে।
- Dual Photon: ফোটনের একটি ডুয়াল (Dual) প্রাকল্পিক কণার অস্তিত্ব আছে।
- Photino: ফোটনের কোনো সুপার পার্টনার আছে। (Clavin, 2020)

মহাকর্ষীয় লেন্স (Gravitational Lensing)

এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জীকে বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করার সরাসরি কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেন নি। মহাবিশ্বের বস্তুরাজির ওপর গবেষণার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো GL । এখন পর্যন্ত জানা মতে এই মহাবিশ্বের দূরবর্তী অঞ্চলের গ্রহ-নক্ষত্র, বা গ্যালাক্সির

ওপর গবেষণার জন্য এই পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। এই টেকনিকটির প্রথম তাত্ত্বিক রূপরেখা প্রস্তাব করেন আইনস্টাইন এবং "Gravitational Lensing" ধারনাটি ব্যবহার করেন (Britannica, 2023)।

GL পদ্ধতির মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের ভরও মাপা হয়। বিশেষত মহাবিশ্বের দূরবর্তী এলাকায় অবস্থানরত উপাদানগুলির ভর বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এই পদ্ধতিতে মাপা হয়। অতি দূরবর্তী কোনো উৎস থেকে যখন কোনো আলোকরশ্মি বিকিরিত হয়ে বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তুরাজির মধ্য দিয়ে যেমন, Cluster of Galaxies, প্রবাহিত হয়ে কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে পৌঁছে (ধরা যাক পৃথিবীতে অবস্থানরত কোনো বিজ্ঞানী হলেন এই পর্যবেক্ষক), তখন উপর্যুক্ত বস্তুপুঞ্জের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কারণে আলোর গতিপথে সামান্য পরিবর্তন ঘটে। এই সমস্ত প্রক্রিয়াটিতে ঐ বস্তুপুঞ্জ হলো GL। এককথায়, GL এর সংজ্ঞা হলো স্পেসের কোনো বস্তুর মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কারণে আলোর গতির যে বিচ্যুতি ঘটে, তা নির্ণয়ের এবং তা থেকে বস্তুটির ভর পরিমাপের একটি পদ্ধতি (চিত্র ৮)।

চিত্র ৮: This image portrays how the gravitational lensing phenomenon, induced by a common galaxy, channels light from a remote galaxy merger, where star formation is occurring. The outcome is a distorted yet amplified view (Image Credit: ESA/ESO/M. Kornmesser at sci.esa.int, 2024).

নিউটন ১৭০৪ সালে প্রথম তাঁর Optics গ্রন্থে মহাবিশ্বে পরিভ্রমণকালে আলোর গতিপথ বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেন। তিনি বলেন, মহাবিশ্বের বড় ধরনের বস্তুর পাশ দিয়ে আলো অতিক্রম করার সময় বস্তুটির মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কারণে আলোর প্রতিসরণ (Deflection) ঘটতে পারে। তাঁর কাজটি ছিল মূলত তাত্ত্বিক। অবশ্য তিনি তাঁর বক্তব্যের একটা গাণিতিক ব্যাখ্যাও প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাজটি বহুদিন অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে। অবশেষে ১৭৮৪ সালে বিজ্ঞানী জন মিচেল (John Mitchell) তত্ত্বটির পুনোরুজ্জীবন করেন। তিনি বলেন সূর্যের আলো পৃথিবীতে প্রবেশের সময় আবহাওয়া মন্ডলগুলির বিভিন্ন উপাদানের সাথে সংঘর্ষের কারণে আলোর গতিপথ বেঁকে (Redshift) যেতে পারে (Hugh, 1911)।

এরপর এগিয়ে আসেন ফন সোল্ডনার (Von Soldner)। তাঁর গবেষণাপত্রটি ১৮০১ সালে করা কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৮০৪ সালে। তিনি একই ধরনের গাণিতিক হিসাব করে বলেন, সূর্যের কাছাকাছি অবস্থিত

তারকাগুলি থেকে নির্গত আলোক রশ্মি যখন সূর্যের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন সেখানে প্রতিসরণের মান হয় ০.৮৪ Arcsec। কিন্তু এই সময়টায় বিজ্ঞানী মিচেল এবং সোল্ডনারের ক্ষুদ্র উপাদানের বিকিরণের তত্ত্ব দুটি অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে। কারণ তখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা আলোর কণাধর্মী বৈশিষ্ট্যের কথা জানতেন না এবং আলোর তরঙ্গধর্মী তত্ত্বকে সঠিক বলে মনে করতেন (Wikipedia, 2024c)।

১৯১১ সালে এই তত্ত্বটির ওপর আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে একটি গাণিতিক হিসাব করেন এবং ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, সম্ভবত মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কারণে আলোর গতিপথ বেঁকে যায়। যার ফলাফল বিজ্ঞানী ফন সোল্ডনারের ফলাফলের খুব কাছাকাছি ছিল। এই কারণে তৎকালীন কিছু বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে নকলের (Plagiarism) অভিযোগ আনেন, যা সম্পুর্ণ ভুল ছিল। কিন্তু এই ভুল বিব্রতকর অভিযোগের কারণে গত শতকের বিশের দশকে আইনস্টাইনকে অপমানকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় (Goldhaber, G. 2008)।

১৯১৯ সালে বিজ্ঞানী এডিংটন এবং ডাইসন সূর্যগ্রহণের সময় একটি বাস্তব পরীক্ষা করেন এবং আইনস্টাইনের ভবিষ্যৎবাণী সঠিক বলে প্রমাণ করে GL তত্ত্বের বাস্তব প্রমাণ দেন (Sauer, 2010)।

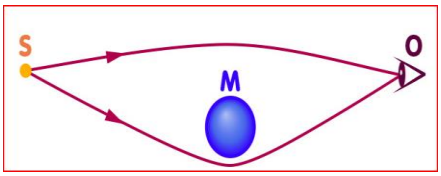

চিত্র ৯: In this depiction, a lens with a mass "M" bends light from a distant source "S" so that it reaches an observer "O" via two separate paths. Consequently, "O" perceives two distinct images of "S". (Credit: Sauer, 2010).

GL এর ক্রমবিকাশে পরবর্তী মৌলিক অবদান রাখেন ক্যালটেকের বিজ্ঞানী Fritz Zwicky। তাঁর গবেষণাটি থেকেই সত্যিকার অর্থে এই বিষয়ের উপর আধুনিক গবেষণার পথ খুলে যায় এবং তাঁর কাজটি পর্যবেক্ষণগত, কেবল তাত্ত্বিক নয়।

GL এর প্রকারভেদ

GL এর তিনটি প্রকার আছে। সেগুলি হলো Strong lensing, Weak lensing এবং Micro lensing।

Strong lensing: GL এর যে বিচ্যুতিগুলি তুলনামূলকভাবে সহজভাবে দেখা যায় সেগুলিকে বলা হয় স্ট্রং লেন্সিং। যেমন Einstein rings এর ছবি। এখানে যদিও বলা হচ্ছে স্ট্রং কিন্তু সেগুলিও অকল্পনীয় ক্ষুদ্র। যে কারণে ওপরে "তুলনামূলক" শব্দটি ব্যবহার করেছি। উদাহরণ- কোনো একটি গ্যালাক্সির ভর যদি সূর্যের চেয়ে ১০০ বিলিয়ন গুণ বেশি হয়, তার যে একাধিক ছবি ওঠে, সেগুলির মধ্যে মাত্র কয়েক আর্কসেকেন্ড (Arcsecond এটি কৌণিক মাপনক্রিয়ার একটি একক, যেমন এক ডিগ্রীর ১/৩৬০০ অংশ হলো এক আর্ক সেকেন্ড) ফাঁক থাকে।

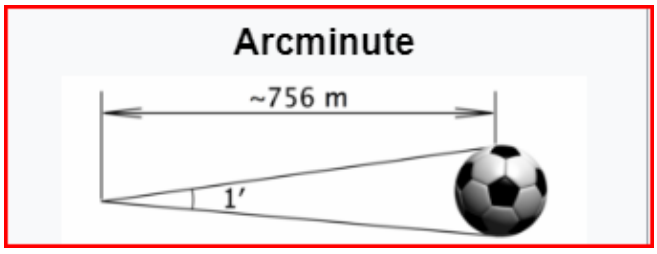

চিত্র ১০: In this depiction, the observer's distance was manually determined from the ball's circumference, measuring approximately 756 m. (Credit: Wikimedia Commons, 2007, Author: RU). URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arcsecond_and_football.png

কিন্তু GL যদি একটি সমগ্র গ্যালাক্সিপুঞ্জ (Galaxy Cluster) হয় তখন সেখানে পার্থক্যটা কয়েক আর্কমিনিট (Arcminute এটিও একটি কৌণিক মাপনক্রিয়ার একটি একক। যেমন- এক ডিগ্রির ১/৬০ হল এক আর্কমিনিট) হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই উপর্যুক্ত গ্যালাক্সিগুলি অনেক দূরে অবস্থিত; সেটি কয়েকশ মেগাপারসেকও (Megaparsec) হতে পারে।

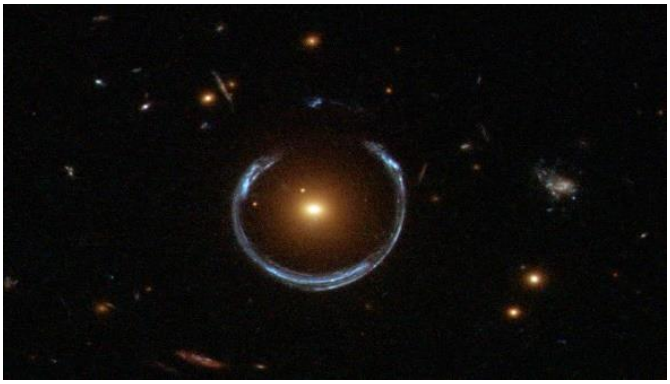

চিত্র ১১: The image shows the gravitational pull of a bright red galaxy warping the light from a distant blue galaxy. Typically, this distortion creates two distinct images of the distant galaxy. However, in this case, the alignment of the lens is so precise that the background galaxy is transformed into a horseshoe shape, forming a nearly complete ring. This phenomenon is known as an Einstein Ring (Credit: Wikimedia Commons. 2011a, Lensshoe_hubble.jpg).

Weak lensing: যখন কোনো উৎসের আলো GL এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তখন কিছু কিছু বিচ্যুতি এতই ক্ষুদ্র হয় যে, তাদেরকে ছবির মধ্যে ধরে রাখা যায় না। এই ধরনের বিচ্যুতিগুলিকে নির্ণয় করা হয় বড় ধরনের সংখ্যাগুলির পরিসংখ্যানগত হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে। এই দুর্বল লেন্সিং এর মাধ্যমেই বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর পরিক্ষণগত প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য গবেষণা করছেন (Wikipedia, 2024d) ।

সাধারণত এই ধরনের পরীক্ষণের জন্য বিশাল গ্যালাক্সি-পুঞ্জকে নির্বাচন করা হয়। এই পদ্ধতিতে বিশ্ব তাত্ত্বিক প্যারামিটারগুলির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের জন্যে গবেষণা হচ্ছে। যেমন- স্ট্যান্ডার্ড বা

লাম্বাডা সিডিএম মডেলের লাম্বাডা ধ্রুবকটি। তাছাড়া এখান থেকে বিজ্ঞানীরা ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর পর্যবেক্ষণগত প্রমাণ আবিষ্কারের জন্যও গবেষণা করছেন, কারণ ডার্ক মেটার বা ডার্ক এনার্জী nonbaryonic উপাদান।

Microlensing: মাইক্রোলেন্সিং GL এরই একটি বিশেষ দিক (Phenomenon)। মাইক্রোলেন্সিং এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের যেসব উপাদানগুলি খুবই ক্ষীণ আলো বিকিরণ করে বা একেবারেই বিকিরণ করে না, তাদেরকে শনাক্ত করা যায়। এই পদ্ধতির প্রথম তাত্ত্বিক প্রকল্পের প্রস্তাব করেন বিজ্ঞানী রেফস্টাল (Refstal); আর তা বাস্তবে আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী এরউইন (Irwin), ১৯৮৮ সালে।

এই মহাবিশ্বের বড় ধরনের উপাদানগুলি, মহাবিশ্বের সমগ্র উপাদানের পরিমাণের তুলনায় খুবই কম, মহাবিশ্বের অধিকাংশ উপাদানই হলো অদৃশ্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র উজ্জ্বল বস্তুগুলি, যেগুলি আলো বিকিরণ করে (যেমন তারা) অথবা কোনো বড় ধরনের বস্তু বা বস্তুপুঞ্জ, যেগুলি আলোর গতিপথকে পরিবর্তন করে (Cluster of gas বা ধুলা) তাদের ওপরই গবেষণা করে থাকেন। এই অদৃশ্য উপাদানগুলি এখন পর্যন্ত আমাদের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতার বাইরে। ঠিক এই ধরনের উপাদানগুলির উপরই গবেষণায় এই মাইক্রোলেন্সিং পাদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন- ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জী।

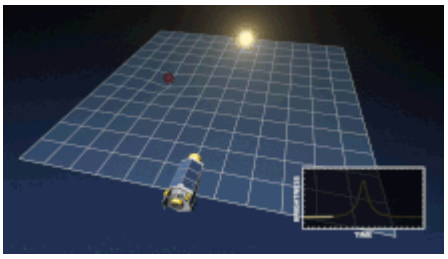

চিত্র ১২: Gravitational microlensing of the light of a distant background star by a passing rogue exoplanet (Image credit: NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle – 2016). As an exoplanet moves in front of a more distant star, its gravity bends the starlight's path, sometimes causing a brief brightening of the background star as observed through a telescope. This gravitational microlensing phenomenon enables scientists to discover exoplanets that are too distant and dark to detect any other way.

GL এর মাধ্যমে দূরবর্তী মহাবিশ্বের যেসব বস্তুরাজির আলো বিকিরিত হয়ে পৃথিবীতে কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে পৌঁছে, তখন আলোর গতিপথ কিছুটা বেঁকে যায়। এই বেঁকে যাওয়ার কারণে পার্শ্ববর্তী কিছু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদান দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠতে পারে; যেটা আলোর গতিপথ বদল না হলে সম্ভব হতো না। এটিই হলো মাক্রোলেন্সিং। এই প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানীরা অসংখ্য অদৃশ্য বা প্রায় অদৃশ্য নতুন মহাজাগতিক বস্তুরাজি আবিষ্কার করছেন (Wikipedia, 2024e)।

ডার্ক এনার্জী তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ক্রমবিকাশ

যদিও ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা ডার্ক এনার্জীর অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে প্রমাণ করেছেন, তা সত্ত্বেও ডার্ক এনার্জী অনেক বেশি প্রাকল্পিক অবস্থায় রয়ে গেছে, ডার্ক মেটারের তুলনায়। ডার্ক এনার্জীর চরিত্র- বৈশিষ্ট্যের অনুমানগুলি বিজ্ঞানীদের কাছে নিতান্ত বিবেচনার (Speculation) বিষয় (Overbye, 2003)।

এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের অনুমান হলো, ডার্ক এনার্জী মহাবিশ্বে সমসত্ত্বভাবে (Homogeneously) বিস্তারিত। এদের ঘনত্ব অনেক কম; মহাকর্ষীয় বল ছাড়া এরা প্রকৃতির অন্যান্য বলগুলির সাথে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে না। ডার্ক এনার্জী মহাকর্ষ বলের সাথে বিকর্ষণধর্মী, বিজ্ঞানে এটিকে অনেক সময় "Gravitational Repulsion" বলা হয়। গাণিতিকভাবে ডার্ক এনার্জী মহাবিশ্বে $10^{-27}/kgm^3$ হারে ছড়িয়ে আছে। এই পরিমাণটি এতই ক্ষুদ্র যে এটি ল্যাবের প্রযুক্তির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় এবং এই ৬৮% ডার্ক এনার্জী খালি স্পেসে (Empty Space) আছে। খালি স্পেস শূন্য নয়, সেখানে ভ্যাকুয়াম এনার্জি থাকে এবং বিজ্ঞানীরা বলেন সম্ভবত সেখান থেকেই উৎসারিত হয় ডার্ক এনার্জী ।

ডার্ক এনার্জীর সবচেয়ে পুরাতন ও সরল ব্যাখ্যা ছিল শক্তির ঘনত্ব শূন্য স্পেসে (Empty Space) থাকে, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় "Vacuum Energy" বলা হয়। গাণিতিকভাবে Vacuum Energy আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবকের সমান। কোয়ান্টাম জগতে কোনো সুপারসিমেট্রি যখন কোয়ান্টাম Fluctuation এর কারণে ভেঙে যায়, তখন সেখান থেকে খালি Virtual বস্তু-প্রতিবস্তু জোড়া হিসেবে উদ্ভূত হয়। যেহেতু তারা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী, তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে এবং উপাদানদ্বয় বিলীন (Annihilate) হয়ে যায় এবং উদ্ভব হয় এনার্জীর, এটিই হলো ভ্যাকুয়াম এনার্জি। বিশ্বতাত্ত্বিক ভ্যাকুয়াম এনার্জির পর্যবেক্ষিত পরিমাণ হলো প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে $১০^{-১০}$ ergs । কিন্তু কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের ভবিষ্যৎবাণী হলো প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে এই পরিমাণ $১০^{১১০}$ ergs (আর্গ হলো শক্তিকে মাপার একটি একক যা $১০^{-৭}$ জুল (Joules) এর সমান)। বিজ্ঞানীরা অবশ্য অনেক আগে থেকেই এই $১০^{১২০}$ গুণ বিশাল পার্থক্যের কথা জনতেন। এই সমস্যার কোনো সন্তোষজনক সমাধান এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা করতে পারেন নি। এই এখানে অনেক বিজ্ঞানী সমাধান হিসেবে স্ট্রিং তত্ত্বকে প্রস্তাব করেন (Britannica, 2023)।

ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর বিজ্ঞানীরা এই মহাবিশ্বের ভর ও শক্তির পরিমাপ করে দেখেন, শক্তির প্রেক্ষাপটে এই মহাবিশ্বে যে পরিমাণ ভর-শক্তি থাকার কথা, তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ ভর এখানে আছে। এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবককে যুক্ত করে সমস্যাটির একটি প্রাকল্পিক সমাধান প্রস্তাব করেন। এটি চূড়ান্ত বিচারে সমাধান হিসেবে প্রমাণিত না হলেও, আইনস্টাইনের ঐ মহাজাগতিক ধ্রুবকটি আবার সঞ্জিবীত হয়ে ওঠে, এবং বিজ্ঞানীরা বলেন, সম্ভবত এখানেই আছে ডার্ক এনার্জীর অস্তিত্বের পরোক্ষ ইঙ্গিত। আর ১৯৯৮ সালে বিজ্ঞানীরা তা পর্যবেক্ষণগতভাবে প্রমাণ করেন (Perlmutter et al., 1998)।

মহাবিশ্বে ডার্ক এনার্জীর অস্তিত্বের প্রথম ইঙ্গিত আসে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে, যদিও তা আইনস্টাইনের অজান্তেই ঘটেছিল। আইনস্টাইন লক্ষ্য করেন, প্রণীত আপেক্ষিক তত্ত্বের সমিকরণগুলির কারণে এই মহাবিশ্ব প্রসারণশীল অথবা সংকোচনশীল হয়ে পরে। সেই সময়টায় স্থির মহাবিশ্ব তত্ত্বটি বিজ্ঞানী মহলে সঠিক বলে মনে করা হতো। তাই তিনি স্থির মহাবিশ্ব তত্ত্বটি, তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে সংযোজনের জন্য, সমিকরণে একটি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (Lambada, Λ) যুক্ত করেন।

আইনস্টাইন বলেন এই মহাবিশ্বে খালি ক্ষেত্র (Empty Space) আছে এবং খালি ক্ষেত্রগুলি খালি নয়, সেখানে শক্তিও (Vacuum Energy) থাকে। এখানে তাঁর চিন্তা ছিল স্থির মহাবিশ্ব কখনো স্থায়ী (Stable) হতে পারেনা। কেননা ভারসাম্য (Equilibrium) কখনোই স্থায়ী নয়। এই মহাবিশ্ব মহাকর্ষ বলের আকর্ষণের কারণে এক সময় সংকোচিত হতে থাকবে অথবা অসমসত্ত্বতার (Inhomogeneities) কারণে মহাবিশ্বের ভারসাম্যে (Equilibrium) পরিবর্তন ঘটবে। সুতরাং এই মহাবিশ্ব যদি খুব সামান্য প্রসারিত হয়, তার অর্থ হলো সেখানে কিছু শূন্য ক্ষেত্র তৈরি হয়। সুতরাং যত বেশি শূন্য ক্ষেত্র তৈরি হবে, তত বেশি শূন্য শক্তি (Vacuum Energy) ও উৎপাদিত হতে থাকবে এক সময় তা মহাকর্ষ বলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং মহাবিশ্ব ধ্বংস (Big Rips) হয়ে যাবে। অন্যদিকে মহাকর্ষ বল যদি ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে, নতুন মহাজাগতীয় উপাদানের উৎপাদনের জন্য, তাহলে এক সময় মহাবিশ্বের সংকোচন শুরু হবে এবং মহাবিশ্ব সিংগুলারিটিতে (Big Crunch) প্রত্যাবর্তন করবে। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে মহাজাগতিক ধ্রুবক সংযোজন করেন, যা মহাকর্ষীয় বলের বিপরীত অর্থ্যাৎ বিকর্ষণধর্মী এবং সেই কারণেই মহাবিশ্ব সংকোচিতও হবে না, আবার প্রসারিতও হবেনা, মহাবিশ্ব হবে চিরস্থির। এবং এই বিকর্ষণধর্মী শক্তির ধারনার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ডার্ক এনার্জীর ধারনা, যা তৎকালীন বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করতে পারেননি, আইনস্টাইন নিজেও নন। তাই পরর্বতীতে বিজ্ঞানী হাবল যখন প্রসারমান মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণগত প্রমাণ দেন, তখন আইনস্টাইন বলেছিলেন বিজ্ঞানের গবেষণায় এটা ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল।

বিজ্ঞানীরা ডার্ক এনার্জীর পর্যবেক্ষণগত প্রমাণের জন্য প্রথমে কোন গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সিপুঞ্জের ভর নির্ণয় করেন। সেই ভরের প্রেক্ষাপটে শক্তির পরিমাণকে মাপতে গিয়ে দেখেন, সেখানে ভরের তুলনায় শক্তির পরিমাণ অনেক বেশি; তার অবধারিত যৌক্তিক পরিণতি হলো গ্যালাক্সি এবং গ্যালাক্সিপুঞ্জগুলিতে অবশ্যই আরো বিপুল পরিমাণের অদৃশ্য বস্তুগত উপাদান রয়েছে, নয়তো ঐ বাড়তি শক্তি আসবে কোথা থেকে?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য তাঁরা প্রথমে কোনো একটি গ্যালাক্সিপুঞ্জের মহাকর্ষীয় অস্থিতির (Instabilities) কারণে যে সমস্ত গ্যালাক্সি তৈরি হয়, তাদের উৎপাদনের হার নির্ণয় করেন। এখানে তাঁরা ব্যবহার করেন টেলিস্কোপ, গ্রাভিটেশনাল লেন্সিং এবং ডপলার পদ্ধতিকে। সেখানে থেকে তারা অতীত মহাবিশ্বের বিবর্তনের হারকে নির্ণয় করেন। তবে এই পদ্ধতিতে মহাজাগতিক বস্তুগুলির যথাযথ দূরত্ব নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন এবং পরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ ডার্ক এনার্জীর পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাবে,

এই মহাবিশ্বের প্রসারণের গতি সেই হারেই বাড়তে থাকবে এবং মহাজাগতিক উপাদানের উৎপাদনের হার ততই কমতে থাকবে।

১৯৩৩ সালে বিজ্ঞানী ৎসুয়িকির গবেষণাটির মাধ্যমে ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রা শুরু হয়। তিনি আবিষ্কার করেন এই মহাবিশ্বে ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর অস্তিত্ব আছে, শুরুতে তিনি এগুলিকে "Missing mass" বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত ডার্ক এনার্জী ক্ষেত্রের সাথে যে আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবকের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে তা বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে পারেন নি।

বিজ্ঞানী ৎসুয়িকির আবিষ্কারের পর পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর ওপর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয় নি। কিন্তু ষাটের দশকে বিজ্ঞানী পেনজিয়াস এবং বিজ্ঞানী উইলসনের CMBR বিকিরণ আবিষ্কারের পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। কণাপদার্থবিদ্যা, বিশ্বতত্ত্ব, জ্যোতিপদার্থবিদ্যা ইত্যাদি প্লাটফর্মগুলি আবার বিজ্ঞানী ৎসুয়িকির "Missing mass" কে শনাক্ত করার জন্য "কোমর বেধে" গবেষণায় নেমে পড়েন এবং ষাটের দশক থেকে এই বিষয়ের ওপর অসংখ্য গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই গবেষণাপত্রগুলির অধিকাংশই ছিল ডার্ক মেটারের ক্ষেত্রে; সেখানে প্রসংগক্রমে ডার্ক এনার্জীর বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল।

তবে আশির দশকে যখন বিজ্ঞানী এলান গুথ (Alan Guth), বিজ্ঞানী আলেক্সি স্টারোবিনস্কি (Alexi Strobinosky) এবং আন্দ্রেই লিন্ডে (Andrei Linde) তাঁদের মহাজাগতিক স্ফিতিতত্ত্ব (Cosmic Inflation) প্রস্তাব করেন, তখন পরিস্থিতি বদলে যায়। কারণ তাঁদের এই তত্ত্বের সাথে ডার্ক এনার্জীর প্রাকল্পিক বৈশিষ্ট্যগুলির ঘনিষ্ট মিল ছিল।

এই তত্ত্বে বলা হয়েছে, মহাবিশ্বে ঋণাত্মক চাপের ক্ষেত্র রয়েছে, যেগুলির সাথে ডার্ক এনার্জীর উপর ভবিষ্যৎবাণী করা চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সাথে ঘনিষ্ট মিল আছে; যেগুলি সম্ভবত আদি মহাবিশ্বের প্রসারণের ক্ষেত্রে অন্যতম মূল ভূমিকা পালন করেছিল। এই প্রসারণের গতি অকল্পনীয় দ্রুত ছিল এবং তা চক্রক্রম (Exponential) হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর এই স্ফিতি মহাবিশ্বের জন্মের পরের এক সেকেন্ডের চেয়ে অনেক অকল্পনীয় ক্ষুদ্র সময়ের পরিসরে ঘটেছিল এবং সমাপ্ত হয়েছিল (Wikipedia. 2024f)।

এখানে বিজ্ঞানীরা বলেন, সাম্প্রতিক গবেষণার প্রেক্ষাপটে মহাবিশ্বে ডার্ক এনার্জীর ঋণাত্মক ঘনত্বের যে পরিমান নির্ণয় করা হয়েছে, স্ফিতির সময় তার পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। তবে তখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট ছিল না, ঐ মহাস্ফিতি থেকেই ডার্ক এনার্জীর উদ্ভব হয়েছিল কি-না। আর মহাস্ফিতি তত্ত্বের বিকাশের পর বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন সৃষ্টি তত্ত্বে মহাজাগতিক ধ্রুবকের আর প্রয়োজন নেই।

বস্তুত "Dark Energy" এর পর্যবেক্ষণগত প্রমাণের গবেষণাটি শুরু হয় ১৯৮০ দশকের শেষের দিকে। শুরুতে বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য ছিল সেই সময়ের বিজ্ঞানীদের যে বিশ্বাস ছিল এই মহাবিশ্ব ক্রমশ সংকোচিত হচ্ছে তত্ত্বটি- তা পরীক্ষা করে দেখা। এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়ার জন্য দুটি গবেষক দল প্রায় একই সময়ে কিন্তু পৃথকভাবে গবেষণা করে। প্রথম গবেষক দলটি গবেষণা শুরু করেন Lowrance

Berkeley National Laboratory এর বিজ্ঞানী সাউল পার্লমুট্টার (Saul Perlmutter) এর নেতৃত্বে। তাঁদের প্রজেক্টের নাম ছিল Supernova Cosmology Project এবং এখানে তাঁরা 1a Supernova গুলিকে বিষয়-বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেন। তবে এই গবেষক দলটি গড়ে তোলার আদি উদগাতা ছিলেন বিজ্ঞানী রিচার্ড মুলার (Richard A. Muller) এবং বিজ্ঞানী পেনিপেকার (Pennypacker)। আর পার্লমুট্টার ছিলেন বিজ্ঞানী মুলারের ছাত্র। এই একই নির্দেশনায় Australian National University এর বিজ্ঞানী ব্রায়ান স্মিথ (Brain Schmidt) এবং Space Telescope Science Institute এর বিজ্ঞানী আদম রিস (Adam Riess) এর নেতৃত্বে High-Z Supernova নামে আরেকটি প্রজেক্ট গঠিত হয় । দুটি গবেষক দলই পৃথিবীর শক্তিশালীতম টেলিস্কোপগুলি এবং স্পেসের হাবল টেলিস্কোপকে ব্যবহার করেন এবং সাত বিলিয়ন আলোকবর্ষ আগের 1a Supernova গুলির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এই মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে এবং তা চিরকালের জন্য চলতে থাকবে ও এই তথ্য-উপাত্তগুলিকে মহাবিশ্বের ধ্রুবকের (Cosmological Constant) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় (Goldhaber, G. 2008)।

১৯৯৮ সালে সাইন্স ম্যাগাজিনে এই গবেষণার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, সেখানে উপসংহারে বলা হয়েছে, "……. An observation that implies the existence of mysterious, self-repelling property of space first proposed by Einstein, which he called the cosmological constant" (Perlmutter et al., 1998)।

১৯৯৬ সালে High-Z Team তাঁদের ডাটা প্রকাশ করে। তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল, মহাবিশ্বের প্রসারণের গতি স্লথতো হচ্ছেই না, বরং দ্রুততর হচ্ছে এবং মহাকর্ষ শক্তির বিপরীত কোনো রহস্যময় শক্তির মাধ্যমে তা ঘটছে। সেই সময়কার বিজ্ঞান বিশ্বে এটি ছিল একটি অবিশ্বাস্য ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্ত। কারণ তখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারনা ছিল এই মহাবিশ্ব মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কারণে ক্রমশ সংকোচিত হবে (APS125, 2009)। ঐ বছরই বিশ্বতত্ত্ববিদ মিশাইন টার্নার (Michael Turner) এই রহস্যময় শক্তির নামকরণ করেন "Dark Energy" (Wikipedia. 2024f)। পরবর্তী দশ বছরের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হন, এই মহাবিশ্ব প্রসারণশীল এবং প্রসারণের বেগ ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু ঐ রহস্যময় Dark Energy অচেনাই থেকে যায় (CTC, 2024)।

বর্তমান বিশ্বের অনেক বিজ্ঞানী বলেন ডার্ক এনার্জির একটা সম্ভাব্য প্রার্থী হলো আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবক; কিন্তু সেখানেও সমস্যা আছে। বিজ্ঞানীরা ডার্ক এনার্জির পরিমাণের যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তার মান আইনস্টাইনের ধ্রুবকের চেয়ে $১০০^{১২০}$ গুন বেশি (APS125, 2009)।

কোয়ান্টাম তত্ত্বে Vacuum Fluctuation এর জন্য যে Virtual উপাদানগুলির উৎপাদন হচ্ছে, সেগুলির এনার্জি Empty Space এ অবস্থান নেয় এবং এই প্রক্রিয়াটি থেকেই বিজ্ঞানীরা ঐ হিসাবটি করেছেন। এখনো বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে তেমন কিছুই জানতে পারেন নি, তাই এই রহস্যময় ডার্ক এনার্জি সত্যই ডার্ক মেটারের বৈশিষ্ট্য কি-না সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত নন (Britannica, 2023)।

উপসংহার

বস্তুত বৈজ্ঞানিক বিশ্বতত্ত্বে বস্তু ও শক্তিকে কখনোই পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, বিষয় দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শক্তি থেকেই বস্তু তৈরি হয়েছে আবার শক্তি বহির্গত হয় বস্তু থেকেই। যেমন- বর্তমানের সর্বজনগৃহীত স্ট্যান্ডার্ড মডেলটি। এখানে মহাবিশ্বের পরিগঠনের মূল উপাদানগুলির কথা বলতে গেলেই অবধারিতভাবে শক্তির প্রসংগটি চলে আসে। কারণ শক্তিও কোনো সাবএটমিক শক্তি-কণার মাধ্যমে কাজ করে। আমরা স্ট্যান্ডার্ড মডেলের আদি কণাগুলি জানি বলেই শক্তির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে পারি। ডার্ক মেটার এবং ডার্ক এনার্জীর ক্ষেত্রেও প্রক্রিয়াটি এক। কিন্তু এখানে সমস্যা হলো ডার্ক এনার্জীর অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণগতভাবে প্রমাণিত হলেও, ডার্ক মেটারের পর্যবেক্ষণগত প্রমাণ বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত হাজির করতে পারেননি। তাই বিজ্ঞানীরা সেখানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন এবং সেখানে ডার্ক এনার্জীর অনুসন্ধানে ডার্ক মেটারের প্রসংগটি অবধারিতভাবে আর্ভিভূত হয়। শক্তি এখানেও কোনো না কোনো সাবএটমিক কণার মাধ্যমে কাজ করে।

ডার্ক মেটার বিশেষত ডার্ক এনার্জী সম্পর্কে পর্যবেক্ষণগত প্রমাণ প্রস্তাব করতে হলে প্রথমে বিজ্ঞানীদেরকে সঠিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি বের করতে হবে। সেটারই বিজ্ঞানীরা এখনো সন্ধান পাননি, সন্ধান করছেন। তাই তাঁরা ডার্ক মেটারকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য, কণাপদার্থবিদ্যা, সুপারসিমেট্রি, আপেক্ষিকতত্ত্ব (মহাকর্ষীয় ধ্রুবক), কোয়ান্টামতত্ত্ব (ক্ষেত্র তত্ত্ব) এ ধরনের নানা জায়গায় অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। অন্যদিকে কালোশক্তিকে জানার জন্য অনুসন্ধান চালাচ্ছেন আস্ট্রফিজিকস, জ্যোর্তিবিদ্যা, টেবিল-টপ, SuperCDMs ইত্যাদি মাধ্যম ও পদ্ধতিতে।

তথ্যসূত্র

Alcock, C., Allsman, R.A., Alves, D.R., Axelrod, T.S., Becker, A.C., Bennett, K.H., et al. 2000, The MACHOs Project: Microlensing Results from 5.7 Years of LMC Observations. URL: https://arxiv.org/pdf/astro-ph/0001272.pdf

AMNH, 2000, Vera Robin and Dark Matter. Am. Museum of Natural History. URL: https://www.amnh.org/learn-teach/curriculum-collections/cosmic-horizons-book/vera-rubin-dark-matter

APS125. 2009, The accelerating expansion of the universe. URL: https://www.aps.org/publications/apsnews/200901/physicshistory.cfm)

Baker, C.J., Bertsche, W., Capra, A., Cesar, C.L., Charlton, M., Christensen, A.G. 2023, Design and Performance of a novel low energy multispecies beamline for an antihydrogen experiment, Physical Rev. Accelerators and Beams. 26: 040101. URL: https://journals.aps.org/prab/pdf/10.1103/PhysRevAccelBeams.26.040101

Bartone, G., Hopper, D. 2016, A History of Dark Matter. PDF: A History of Dark Matter-Gianfranco Bertone & Dan Hooper (caltech.edu)

Britannica. 2023, Gravitational Lens. Encyclopedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/science/gravitational-lens

Clavin, W. 2020, Where is Dark Matter Hiding. Calthech magagine. URL: https://magazine.caltech.edu/post/where-is-dark-matter-hiding

Craig, N. 2014, The State of Supersymmetry after Run I of the LHC. CGI Workshop URL: https://arxiv.org/pdf/1309.0528.pdf

Griest, K. 1996, Thermal Relics as Dark Matter (Wimps). The Net Advance of Physics: The Nature of the Dark Matter. URL: Thermal Relics as Dark Matter (Wimps) (mit.edu)

CTC. 2024, The Origin of the Universe: Inflation. The Stephen Hawking Center for Theoretical Cosmology. URL: https://www.ctc.cam.ac.uk/outreach/origins/inflation_zero.php)

Goldhaber, G. 2008. The Acceleration of the Expansion of the Universe: A Brief Early History of the Supernova Cosmology Project (SCP). Dark Matter Conference DM08. URL: https://arxiv.org/pdf/0907.3526

Helmenstine, A. 2024, What is Antimatter? Definition and Examples. Science Notes. URL: https://sciencenotes.org/what-is-antimatter-definition-and-examples/

Hugh, C. 1911, Michell John – Encyclopedia Britannica. Cambridge University Press. 18 (11th ed): 370–371.

Jangman, G., Kamionkowsky, M., K.Griest, K. 1995, Supersymmetric Dark Matter. Elsvier. URL: PII: 0370-1573(95)00058-5 (sciencedirectassets.com)

Kapetyn J.C.1922, What constitudes the dark matter, First attempt at a theory of the arrangement and motion of the sidereal system. Am. Astro. Soc. URL: https://web.archive.org/web/20160205163816/http://indico.cern.ch/event/300768/session/0/contribution/30/attachments/566901/780884/Rosenberg-Patras_30jun14.pdf

Kelvin, W. 1904, Baltimore lectures on molecular dynamics and wave theory of light 1884, Public Domain, Lecture XVI; Cambridge University Press. URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ien.35556038198842&view=1up&seq=304

Kell, R. 2019. *In:* How does gravity affect photons (that is, bent light) if photons have no mass? URL: https://www.astronomy.com/science/how-does-gravity-affect-photons-that-is-bend-light-if-photons-have-no-mass/

Leo, M.D., 2018, Rotational curve of spiral galaxy Messier 33 (Triangulum).png. Wilipedia Commons.
URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotation_curve_of_spiral_galaxy_Messier_33_(Triangulum).png

Luminet, J. 2020, The Dark Matter Enigma. The Int. Rev. Sci. 5 n°3: 1-11. URL: https://browse.arxiv.org/pdf/2101.10127.pdf

NASA, 2005. Imagine the Universe**.** URL: https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/galaxies/imagine/hidden_mass.html

NASA, 2016. Searching for Far Out and Wandering Worlds**.** URL: https://www.jpl.nasa.gov/news/searching-for-far-out-and-wandering-worlds

NASA. 2017, Flaring Red Dwarf Star. URL: https://www.nasa.gov/image-article/flaring-red-dwarf-star/

Overbye, D. 2003, Astronomers report Evidence of 'Dark Energy' Splitting the Universe. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2003/07/22/us/astronomers-report-evidence-of-dark-energy-splitting-the-universe.html

Perlmutter, S., Preuss, P., Yarris, L. 1998, Science Magazine Names Supernova Cosmology Project 'Breakthrough of the Year' Berkeley Lab, Ca URL: Science magazine names Supernova Cosmology Project "Breakthrough of the Year" for 1998 (lbl.gov)

Poincare, H. 1906, The Milky way and the theory of gases. Popular Astronomy, 14: 475-488. URL: https://articles.adsabs.harvard.edu//full/1906PA.....14..475P/0000478.000.html

Rajasekaran, G. 2016, The Story of the Neutrino. URL: https://arxiv.org/pdf/1606.08715.pdf#:~:text=Until%20some%20years%20ago%2C%20neutrinos,knowledge%20of%20physics%20and%20astronomy

Sanders, R. 2017, MACHOs are dead, WIMPs are a no-show. Say hello to SIMPs: New Candidate for Dark Matter. Phys.Org. URL: https://phys.org/news/2017-12-machos-dead-wimps-no-showsay-simps.html

Sauer, T. 2010, A brief History of Gravitational Lensing. Einstein Online. URL: https://www.einstein-online.info/en/spotlight/grav_lensing_history/

Sci.esa.int. 2024, How Gravitational lensing Acts as a Magnifying Glass. (Copyright: ESA/ESO/M. Kornmesser). URL: https://sci.esa.int/web/hubble/-/54553-how-gravitational-lensing-acts-as-a-magnifying-glass-diagram

Wikipedia. 2023, Axion. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Axion

Wikipedia. 2024a. Particle Physics. Url: https://en.wikipedia.org/wiki/Particle_physics

Wikipedia. 2024b. Red Dwarf. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Red_dwarf

Wikipedia. 2024c, Strong Gravitational Lensing, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Strong_gravitational_lensing

Wikipedia. 2024d, Gravitational Microlensing. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_microlensing#/media/File:Gravitational_lens.gif

Wikipedia. 2024e, Dark Energy. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy

Wikimedia Commons. 2006, Sirus A and B Hubble photo. Edited. PNG. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sirius_A_and_B_Hubble_photo.editted.PNG

Wikimedia Commons. 2007, Arcsecond and Football.png. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arcsecond_and_football.png

Wikimedia Commons. 2011a, A Horseshoe Einstein Ring from Hubble.JPG. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Horseshoe_Einstein_Ring_from_Hubble.JPG

Wikimedia Commons. 2011b. Gravitational micro rev.svg. URL:

Wikimedia Commons. 2020, PIA23685-Planet-BrownDwarf-Stars.jpg. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PIA23685-Planets-BrownDwarfs-Stars.jpg

An open-access APC-free journal
ISSN: 2981-8184

REVIEW PAPER

Climate-Adaptive Solution to Plastic Waste Management in Bangladesh

Fariha Rahman*, Sadik Khan

Department of Civil and Environmental Engineering & Industrial Systems and Technology
Jackson State University, Jackson, MS 39217

*Correspondence: Fariha Rahman
Email: j00986301@students.jsums.edu

Received: 7/4/2024 / Accepted: 7/19/2024

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13131742

Abstract

With rapid urbanization and economic development in Bangladesh, waste production is also increasing rapidly. Recycled Plastic Pin (RPP) and plastic roads can play a crucial role in combating climate change and managing plastic waste. Plastic pins made from recycled plastic enhance soil stability, preventing landslides and soil erosion caused by heavy rain and flooding. This RPP contributes to mitigating the adverse effects of climate change. These pins ensure the reuse of plastic waste, helping maintain environmental balance. In constructing plastic roads, bitumen mixed with plastic waste is used, which is more durable and cost-effective than conventional roads. These roads are more resistant to temperature fluctuations and heavy rainfall, increasing their lifespan and reducing climate change-induced damage. The construction processes of plastic pins and plastic roads result in lower carbon emissions and reduced fuel consumption, thereby helping to reduce the overall carbon footprint.

Keywords: Plastic Waste, Climate Change, Recycled Plastic Pin, Plastic Road, Climate Resiliency

Citation: *F. Rahman, S. Khan. 2024, Transformative Solution to Plastic Waste Management in Bangladesh, Bangla J. Interdisciplinary Sci., 2 (1): B41-B50.*

বাংলাদেশের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জলবায়ু সহনশীল সমাধান

সারাংশ

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে বর্জ্য উৎপাদনও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্লাস্টিক পিন বা Recycled Plastic Pin (RPP) এবং প্লাস্টিক রোড জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই ও প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক থেকে তৈরি প্লাস্টিক পিন মাটির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে সৃষ্ট ভূমিধস এবং মাটির ক্ষয় প্রতিরোধ করতে সক্ষম ভুমিকা পালন করে- যা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে। এ পিনগুলো পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক ব্যবহার করে তৈরি হওয়ায় প্লাস্টিক বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করে- যা পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক। প্লাস্টিক রোড নির্মাণে প্লাস্টিক বর্জ্য মিশ্রিত বিটুমিন ব্যবহার করা হয়- যা প্রচলিত রাস্তার তুলনায় অধিক স্থায়িত্বশীল এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমায়। এই রাস্তাগুলো তাপমাত্রা এবং ভারী বৃষ্টিপাতের প্রতি অধিক সহনশীল হওয়ায় রাস্তাগুলোর আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কমায়। প্লাস্টিক পিন ও প্লাস্টিক রোড নির্মাণ প্রক্রিয়ায় কার্বন নিঃসরণ কম হয় এবং কম জ্বালানি প্রয়োজন হয়- যা সামগ্রিকভাবে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

চাবিশব্দ: প্লাস্টিক বর্জ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, Recycled Plastic Pin, প্লাস্টিক রোড, জলবায়ু সহনশীলতা

ভূমিকা

দ্রুত নগরায়ণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় দেশগুলোর মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। কিন্তু একই সাথে বাংলাদেশে দৈনিক বর্জ্য উৎপাদনের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত তিন দশকে বর্জ্যের পরিমাণ প্রতি ১৫ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। নগর এলাকায় গড়ে মাত্র ৪৫% কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়- যা অর্ধেকেরও কম (Islam, 2021)। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে দৈনিক কঠিন বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২৫,০০০ টন- যা প্রতি বছর মাথাপিছু ১৭০ কেজি বর্জ্য উৎপাদনের সমান। দেশের মোট শহুরে বর্জ্যের এক-চতুর্থাংশই ঢাকা শহর উৎপন্ন করে (Ahmed, 2019)। বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যাকে আরো তরান্বিত করছে বিপুল পরিমাণে প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে ৬.৫ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদিত হয়, যেখানে প্রতিদিন প্রায় ৩০০০ টন নতুন প্লাস্টিক বর্জ্য যুক্ত হচ্ছে। তাই প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতি বছর বঙ্গোপসাগরে প্রায় ২৬ লাখ ৩৭ হাজার ১৭৯ টন প্লাস্টিক বর্জ্য নিঃসৃত হচ্ছে (ESDO, 2023)। বাংলাদেশে প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থার বেশিরভাগই অনানুষ্ঠানিক এবং অনিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশের গৃহস্থালী পর্যায়ে অন্যান্য প্লাস্টিক বর্জ্যের তুলনায় প্যাকেজিং বর্জ্য বেশি উৎপন্ন হয়, যার বেশিরভাগই কম ঘনত্বের পলিথিন বা low density polyethylene (LDPE)।

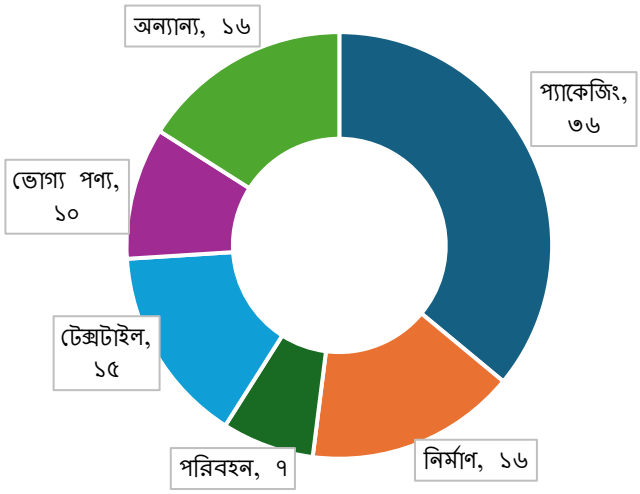

চিত্র ১. বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সেক্টরে প্লাস্টিকের ব্যবহার (সূত্র: Deutsche Welle)

বাংলাদেশে প্লাস্টিকের ব্যবহার এবং পরিবেশের উপর প্লাস্টিক বর্জ্যের বিরূপ প্রভাব

পর্যাপ্ত সুবিধার অভাব, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অপর্যাপ্ত বাজেট বাংলাদেশে অনুপযুক্ত প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে কয়েকটি (Mourshed, et al., 2017)। বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে প্রতি বছর মাথাপিছু প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ ২০০৫ সালে ৩ কেজি থেকে বেড়ে ২০২০ সালে ৯ কেজি হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র ৩১ শতাংশ প্লাস্টিকই পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা হয়। সবচেয়ে বেশি প্লাস্টিক দূষণ ঘটে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক যেমন: শপিং ব্যাগ ও প্যাকেট থেকে (Uddin, 2022)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব প্লাস্টিক বর্জ্য পোড়ানো হয় এবং অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের সাথে একসাথে নিষ্কাশন করা হয়। এই বিশাল অব্যবস্থাপিত প্লাস্টিক বর্জ্য ক্রমবর্ধমান দূষণ সংকটকে আরো কঠিন করে তোলে। এসকল বর্জ্য মাটি এবং পানির সাথে মিশে, এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে অপ্রতুল করে দেয়। ফলে প্রায়শই বন্যা এবং নদী দূষণের মতো দুর্যোগ দেখা দেয়। এছাড়াও যত্রতত্র বর্জ্য পোড়ানো ও নিষ্কাশনের কারণে শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার মতো ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেহেতু নদীগুলো সমুদ্রে নিঃসৃত হয় তাই জলপথে প্লাস্টিক দূষণ সরাসরি সামুদ্রিক দূষণের সাথে যুক্ত।

প্লাস্টিক বর্জ্য এবং দূষণ অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যগত ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক প্যাকেজিং (বিশেষ করে পলিইথিলিন ব্যাগ) বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করে। গত কয়েক দশকে বিশেষ করে বর্ষাকালে নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্লাস্টিক বর্জ্যের কারণে বন্যার ঝুঁকি বেড়েছে (McVeigh, 2023)। যার কারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য খরচ বহন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা) ২০১৮ সালে শহরের পয়ঃনিষ্কাশন পরিষ্কার করতে প্রায় ২৩ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে- যার মধ্যে ২৫ কিলোমিটার খাল খনন এবং ২৯০ কিলোমিটার ড্রেন পরিষ্কার অন্তর্ভুক্ত ছিল (Molla 2018)।

নদী ও খালের তলদেশে জলজ গাছপালা দ্বারা আটকে থাকা প্লাস্টিক বর্জ্য নাব্যতাকে প্রভাবিত করে এবং ড্রেজিং কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে (Chowdhury, et al., 2021)। এছাড়াও মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের মাধ্যমে এসব বর্জ্য পানির গুণগত মান এবং খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে। বঙ্গোপসাগর এবং ঢাকার আশেপাশের নদী থেকে সংগৃহীত মাছের নমুনা পরীক্ষা করে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে (Khan and Setu, 2022; Hossain, et al., 2019)।

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার রূপান্তরকারী (Transformative) সমাধান

পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক পিন বা Recycled Plastic Pin (RPP)

নির্মাণ সামগ্রী ও অবকাঠামো শিল্পে প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে- যা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচন করছে। পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক পিন বা Recycled Plastic Pin (RPP) প্লাস্টিক বর্জ্য এবং পরিবেশগত অবনতির বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। পোস্ট-কনজিউমার প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে তৈরি যেমন: পলিমার, করাতের গুঁড়ো এবং ফ্লাই অ্যাশ ব্যবহার করে প্লাস্টিক পিন তৈরি করা হয় (Khan, et al., 2013)। ভূমিধস এবং রাস্তার ঢালে মাটির ক্ষয় এড়ানোর জন্য প্লাস্টিক পিন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ঢাল স্থিতিশীলতার (slope stability) জন্য প্রচলিত পদ্ধতিগুলো প্রায়ই কংক্রিট এবং ইস্পাত ব্যবহার করে- যা কেবল ব্যয়বহুল নয় বরং পরিবেশগতভাবেও ক্ষতিকর। এর বিপরীতে, RPP একটি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প সমাধান। অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীর তুলনায় এসকল পিন রাসায়নিক এবং জীববৈজ্ঞানিক আক্রমণের প্রতি কম সংবেদনশীল (Loehr, et al., 2007)।

পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক পিনের আরেকটি প্রধান সুবিধা হলো তাদের হালকা ওজন। প্রচলিত ধাতব পিনগুলোর তুলনায় পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক পিনগুলো অনেক হালকা- যা পরিবহন এবং স্থাপন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে। যার জন্য এটি নির্মাণখাতে অত্যন্ত উপযোগী। কারণ এটি শ্রম এবং সময় উভয়ই সাশ্রয় করে এবং প্রকল্পগুলোকে আরো দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে (Bowders, et al., 2003)। RPP পরিবহন এবং স্থাপন করতে সহজ, এবং বাহ্যিক আর্দ্রতা ও ক্ষয় প্রতিরোধ করতে সক্ষম। রাস্তার পাশের ঢালে ধ্বস এড়ানোর ক্ষেত্রে RPP বাড়তি স্থিতিশীলতা প্রদান করে। RPP মূলত ব্যবহৃত প্লাস্টিক বোতল ব্যবহার করে তৈরি করা হয়, এবং প্রায় ৬০০ বোতল একটি RPP উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে RPP তৈরির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ প্লাস্টিকের বোতল ল্যান্ডফিলে নিষ্কাশিত হওয়া থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। ফলে ল্যান্ডফিলে আগত বর্জ্যের পরিমাণ কমে ও ল্যান্ডফিলের সময়কাল বৃদ্ধি পায়।

RPP উৎপাদন প্রক্রিয়া প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ দিয়ে শুরু হয়। সংগ্রহের পর, প্লাস্টিক পরিষ্কার এবং গুঁড়া (pulverised) করা হয় এবং RPP উৎপাদন সাইটে প্রেরণ করা হয়। RPP তৈরির দুটি পদ্ধতি হলো: ইনজেকশন মোল্ডিং প্রক্রিয়া (injection moulding process) এবং ক্রমাগত এক্সট্রুশন প্রক্রিয়া (continuous extrusion process)। ইনজেকশন মোল্ডিং প্রক্রিয়ায় গলিত প্লাস্টিক একটি ছাঁচ বা মোল্ডে

ইনজেক্ট করা হয়- যা পণ্যের আকার এবং দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে। এ প্রক্রিয়াটি সহজ এবং তুলনামূলক সাশ্রয়ী, তবে উৎপাদন পরিমাণ সীমিত। ক্রমাগত এক্সট্রুশন প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের RPP উৎপাদনের সুযোগ দেয়। এই প্রক্রিয়ায়, গলিত প্লাস্টিক ধারাবাহিকভাবে একটি সিরিজ ডাইসের মাধ্যমে এক্সট্রুড করা হয়- যা শীতল হওয়ার সময় নির্দিষ্ট আকৃতি লাভ করে (Hossain, et al., 2017)।

চিত্র ২. পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক ব্যবহার করে তৈরি Recycled Plastic Pin

প্লাস্টিক রোড

রাস্তার ক্ষয় বা pavement distress রোধের ক্ষেত্রেও প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে দুইটি এলাকায় প্লাস্টিক রোড নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সড়কের বিটুমিনাস স্তরের নিচের বেস পাথর ও বালির সাথে প্লাস্টিক মেশানো হয়েছে এবং অন্যটিতে বেস টাইপ-১ স্তরে কোনো প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়নি। সংক্ষেপে বেস টাইপ স্তরে পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক পাথর এবং বিটুমিনকে প্রতিস্থাপন করতে পারে। এক্ষেত্রে, পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক হিসেবে high density polyethylene (HDPE), LDPE এবং Polypropylene (PP) এর মিশ্রণ ব্যবহার সম্ভব।

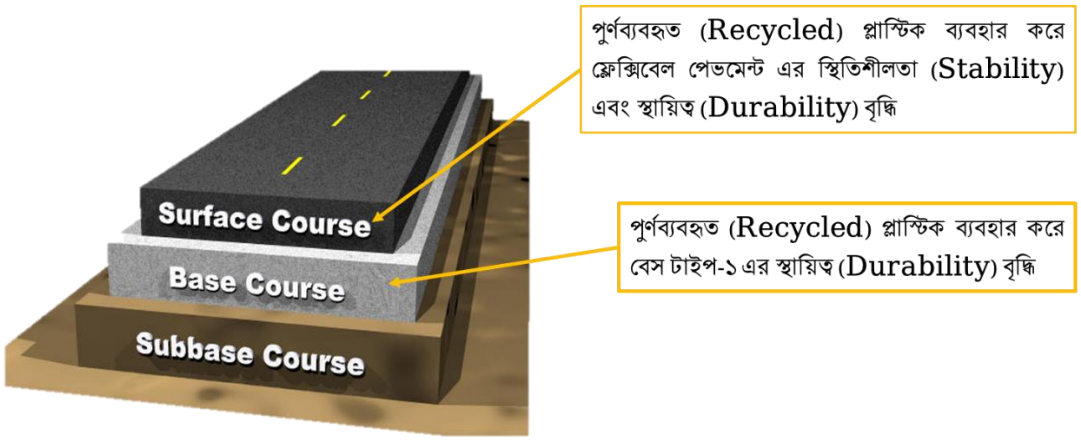

চিত্র ৩. সড়কের বিভিন্ন স্তরে পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ব্যবহার

বাংলাদেশের সড়ক নির্মাণ সামগ্রীর বেশিরভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়- যা ব্যয়বহুল। প্লাস্টিকের ব্যবহার বিটুমিনকে অনেকাংশে প্রতিস্থাপন করে বিটুমিনের পরিমাণ কমায়- যা সড়ক নির্মাণের খরচ কমাতে সাহায্য করবে। একই সাথে এটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহায়ক এবং সড়কের ক্ষয় বা রাটিং কমাবে।

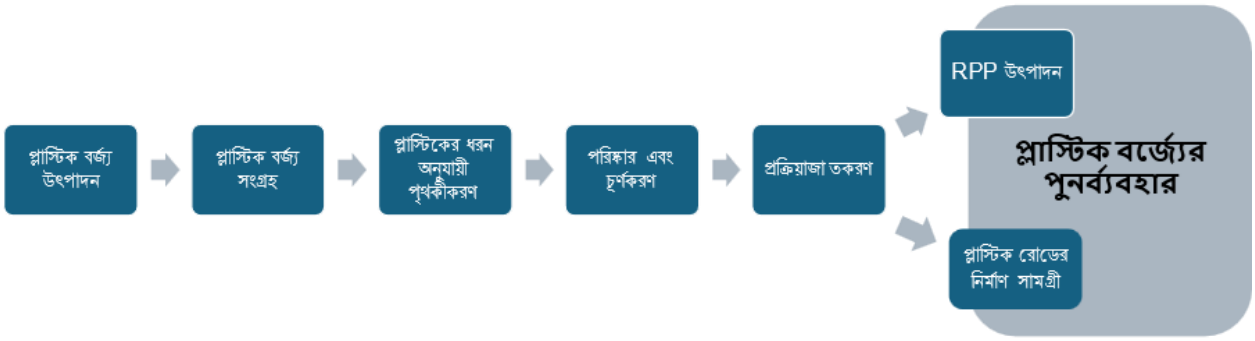

চিত্র ৪. প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে RPP ও প্লাস্টিক রোড তৈরির ভ্যালু চেইন

বাংলাদেশের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নীতিগত দিক

বাংলাদেশ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০০২ সালে প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়। যদিও বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে প্লাস্টিক এবং পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করে পলিথিন ব্যবহারে সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তা সত্ত্বেও, গত ১৫ বছরে এর ব্যবহার তিন গুণ বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫ সালে শহরাঞ্চলে প্লাস্টিকের গড় ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩.৩০ কিলোগ্রাম, যা ২০২০ সালে ৯ কিলোগ্রামে দাঁড়িয়েছে (Jahan, 2023)। বাজার পর্যবেক্ষণের অভাব,

আইন প্রয়োগের অভাব এবং শিল্পপতিদের চাপের কারণে ২০০৬ সালের পর এই নীতি ব্যর্থ হয় (Sadik, 2023)।

২০২০ সালে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করার জন্য উচ্চ আদালতের আদেশ জারি করা হয়। জাতীয় কর্মপরিকল্পনায়, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% প্লাস্টিক পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার, ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০% একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বিলোপ করার এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন ৩০% কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে (The Business Standard, 2021)।

বাংলাদেশে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিগত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞার কঠোর প্রয়োগ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য শিল্পকে উদ্দীপনা প্রদান এবং শহুরে পরিকল্পনায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করা, প্লাস্টিকের বিকল্প উদ্ভাবনে প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি এর মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও, পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক সড়ক ও অবকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যবহারের মতো উদ্ভাবনী সমাধানগুলো বিকাশের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা উচিৎ। প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিবেশগত প্রভাব এবং পুনর্ব্যবহারের সুবিধাগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষামূলক প্রচারণা দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তন

প্লাস্টিক উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রচুর পরিমাণে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতিবছর প্লাস্টিকের উৎপাদন এবং জ্বলন থেকে লক্ষ লক্ষ টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়- যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণগুলোর মধ্যে একটি (Geyer, Jemback, and Law 2017)। প্লাস্টিক বর্জ্য প্রাকৃতিক পানিচক্রেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। প্লাস্টিকের বর্জ্য নদী এবং সমুদ্রে প্রবেশ করলে তা জলজ বাস্তুতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে। উদাহরণস্বরূপ, প্লাস্টিকের মাইক্রোপার্টিকলগুলো পানি শোষণের ক্ষমতা কমায় এবং মাটির উর্বরতা হ্রাস করে- যা কৃষিকাজ এবং পানির পুনঃপ্রবাহকে প্রভাবিত করে (Thompson, et al., 2009)।

প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাসের মাধ্যমে এ প্রভাবগুলো কমানো সম্ভব। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমালে এবং পুনর্ব্যবহার বাড়ালে নদী এবং সমুদ্রের প্লাস্টিক দূষণ কমবে ও প্রাকৃতিক জলচক্রের ভারসাম্য রক্ষা পাবে। প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাসের ফলে পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মাটির উর্বরতা রক্ষা পায়- যা কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের সুস্থতা নিশ্চিত করে।

RPP এবং প্লাস্টিক রোড দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- যা জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সারা বিশ্বে অনুভূত হচ্ছে, এবং এটি আমাদের অবকাঠামো এবং পরিবেশকে হুমকির সম্মুখীন করছে। এ সমস্যার মোকাবিলায় প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার এবং এটির কার্যকর ব্যবহার একটি সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে। এ ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্লাস্টিক বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহার করা হয়- যা পরিবেশে প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করে। প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে উৎপাদিত এ পিনগুলো বেশ টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী ও পরিবেশ বান্ধব। ধরনের প্রযুক্তিগুলো

তুলনামূলকভাবে সস্তা কেননা এতে সিমেন্ট বা রড এর মতো ব্যয়বহুল নির্মাণ সামগ্রী কম ব্যবহৃত হয়। তাছাড়াও, সিমেন্ট বা রড উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রচুর গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসৃত হয়। এসবের বিকল্প হিসেবে প্লাস্টিক বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার একটি টেকসই সমাধান দিতে পারে। সহজলভ্য হওয়ায় এটি বিভিন্ন কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। প্লাস্টিক পিন ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা যায় এবং পরিবেশ দূষণ কমানো যায়।

উপসংহার

বাংলাদেশে প্লাস্টিক পিন এবং প্লাস্টিক রোড জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক থেকে তৈরি প্লাস্টিক পিন মাটির স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে সৃষ্ট ভূমিধস এবং মাটির ক্ষয় প্রতিরোধ করে- যা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করবে। পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্লাস্টিক রোড নির্মাণ প্রক্রিয়ায় প্লাস্টিক বর্জ্য মিশ্রিত বিটুমিন ব্যবহার করা হয়- যা প্রচলিত রাস্তার তুলনায় অধিক স্থায়িত্ব প্রদান করে। এ রাস্তাগুলো তাপমাত্রা এবং ভারী বৃষ্টিপাতের প্রতি অধিক সহনশীল। ফলে রাস্তাগুলোর আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পায় এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমে যায়। প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রীর বিকল্প ব্যবহারের কারণে গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো সম্ভব। সামগ্রিকভাবে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল ও কার্বন নেগেটিভ সমাধান হিসেবে প্লাস্টিক পিন ও প্লাস্টিক রোড গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম।

তথ্যসূত্র

Ahmed, N. 2019, When the Garbage Piles Up. The Daily Star. URL: https://www.thedailystar.net/opinion/environment/news/when-the-garbage-piles-1810375.

Bowders, J. J., Loehr, J.E., Salim, H., Chen, C. 2003, Engineering Properties of Recycled Plastic Pins for Slope Stabilization. Transportation Research Record, 1849 (1): 39-46. DOI: https://doi.org/10.3141/1849-05

Chowdhury, G. W., Koldewey, H. J., Duncan, E., Napper, I. E., Niloy, M. N. H., Nelms, S. E., Sarker, S., Bhola, S., Nishat, B. 2021, Plastic Pollution in Aquatic Systems in Bangladesh: A Review of Current Knowledge. Science of The Total Environment, 761: 143285. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143285.

ESDO. 2023, Historic Global Plastic Treaty Should Change the Tragic Tale of Our River! - ESDO. URL: https://esdo.org/historic-global-plastic-treaty-should-change-the-tragic-tale-of-our-river/.

Geyer, R., Jemback, J. R., Law, K. L. 2017, Production, Use, and Fate of All Plastics Ever Made. Science Advances. URL: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1700782.

Hossain, M. S., Sobhan, F., Uddin, M. N., Sharifuzzaman, S. M., Chowdhury, S. R., Sarker, S., Chowdhury, M. S. N. 2019, Microplastics in Fishes from the Northern Bay of Bengal. Science of The Total Environment, 690: 821-30. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.065.

Hossain, S., Khan, S., Kibria, G. 2017, Sustainable Slope Stabilisation Using Recycled Plastic Pins. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL.

Islam, S. 2021, Urban Waste Management in Bangladesh: An Overview with a Focus on Dhaka.

Jahan, A., Tahseen, R. 2023, What Happened to Bangladesh's Polythene Ban? The Confluence (blog). URL: https://theconfluence.blog/what-happened-to-bangladeshs-polythene-ban/.

Khan, S., Kibria, G., Hossain, S., Hossain, J., Lozano, N. 2013, Performance Evaluation of a Slope Reinforced with Recycled Plastic Pin. ASCE Library, March: 1733-42. DOI: https://doi.org/10.1061/9780784412787.174

Khan, S., Setu, S. 2022, Microplastic Ingestion by Fishes from Jamuna River, Bangladesh. Environ. Nat. Resources J, 20 (2): 1-11. DOI: https://doi.org/10.32526/ennrj/20/202100164.

Loehr, J., John, E., Bowders, J. 2007, Slope Stabilization Using Recycled Plastic Pins, Phase III. University of Missouri--Columbia. Dept. of Civil and Environmental Engineering, and Missouri. Dept. of Transportation. URL: https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/3287.

McVeigh, K. 2023, Plastic Waste Puts Millions of World's Poorest at Higher Risk from Floods. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/environment/2023/may/24/plastic-waste-puts-millions-of-worlds-poorest-at-higher-risk-from-floods.

Molla, M. 2018, In the Rains, Plastic Bags Are Worsening the Flooding in Bangladesh's Cities. Scroll. URL: https://scroll.in/article/883236/in-the-rains-plastic-bags-are-worsening-the-flooding-in-bangladeshs-cities.

Mourshed, M., Masud, M. H., Rashid, F., Joardder, M. U. H. 2017, Towards the Effective Plastic Waste Management in Bangladesh: A Review. Environ. Sci. Pollution Res., 24 (35): 27021-46. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-017-0429-9.

Sadik, M. F. 2023, The Policy Failure of Polythene Ban in 2002, and Its Reemergence in Markets. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22954.39363.

The Business Standard. 2021, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% প্লাস্টিক বর্জ্য কমানোর লক্ষ্য বাংলাদেশের" The Business Standard. URL: https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6/news-details-77833.

Thompson, R. C., Moore, C. J., vom Saal, F. S., Swan, S. H. 2009, Plastics, the Environment and Human Health: Current Consensus and Future Trends. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 364 (1526): 2153-66. DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0053.

Uddin, N. 2022, Ensuring Plastic Waste-Free Sustainable Bangladesh. Press Xpress (blog). URL: https://pressxpress.org/2022/07/13/ensuring-plastic-waste-free-sustainable-bangladesh/.

An open-access APC-free journal
ISSN: 2981-8184

REVIEW PAPER

The Sundarbans, the World's Largest Tidal Halophytic Mangrove Forest: Its Economic and Ecological Significance

M. S. Zaman[1,2], Tabina H. Chowdhury[3]

[1]Department of Biological Sciences, Alcorn State University, Lorman, MS 39096
[2]Department of Biology, South Texas College, McAllen, TX 78501
[3]Edmond Memorial Highschool, Edmond, OK 73013

**Correspondence: M. S. Zaman*
Emails: zaman@alcorn.edu, mzaman@southtexascollege.edu

Received: 6/14/2024 / Accepted: 7/7/2024

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13251085

Abstract

The Sundarbans, located along the southwestern coast of Bangladesh and southeastern India, is a remarkable ecosystem characterized by extensive mangrove forests, marshlands, and waterways, spreading across approximately 10,000 square kilometers. This vast area is recognized as the world's largest tidal halophytic mangrove forest, known for its ability to thrive in warm, humid climates and its unique assortment of salt-resistant plant life. The Sundarbans mangroves are essential for the livelihoods of coastal communities, supporting fishing industries and offering resources like timber, fuel woods, honey, and medicinal plants. Moreover, the mangroves play a crucial role in coastal protection, shielding against cyclones, storm surges, tidal waves, and erosion. Additionally, the mangroves serve essential ecological functions, including carbon sequestration, and providing habitats for various plant and animal species. Despite the pivotal functions, the mangroves face significant threats from human activities, notably pollution, land use changes, and the impacts of climate change. The escalating demand for resources has led to extensive deforestation resulting in habitat degradation and a reduction in the Sundarbans' size. This review delves into the economic and ecological features of the Sundarbans, examining its landscapes, biodiversity, and the obstacles posed by resource exploitation, and climate change, while also considering potential strategies for mitigation.

Keywords: Sundarbans, mangrove forest, ecological and economic significance, climate change

(Please click this link to access the full English version of the article)

Citation: *Ullah, M. Iftekhar. 2024, A Review of the Effectiveness and Safety of Intermittent Fasting, Bangla J. Interdisciplinary Sci., 2 (1): B51-B69.*

সুন্দরবন, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জোয়ার-ভাটা সমন্বিত, লবণাক্ততা সহনশীল, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল: এর অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত গুরুত্ব

সারাংশ

সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১০,০০০ বর্গ কি.মি. জুড়ে বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (Mangrove forests)- যা ভূমি, জলাভূমি, নদী, শাখানদী, খাল এবং বনাঞ্চলের একটি বিচিত্র সমন্বয়। জলবায়ু এখানে আর্দ্র ও গরম এবং এখানে রয়েছে বিচিত্র প্রাণী এবং উদ্ভিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জটিল ইকোসিস্টেম। এ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলটি উপকূলবর্তী জনপদের জীবন ধারণের অপরিহার্য অঙ্গ। বেঁচে থাকার এ উৎসগুলো হলো মাছ ব্যবসা, বাড়ি-ঘর বানানোর কাঠ, জ্বালানী কাঠ, ও মধু সংগ্রহ। বিভিন্ন ধরনের ঔষুধ তৈরির গাছগাছড়াও এখানে পাওয়া যায়। এ এলাকাটির ইকোলজিক্যাল গুরুত্বও অপরিসীম। এ বনাঞ্চল কার্বন প্রক্রিয়াকরণ (Sequestration), ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থলভাগ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া, বিভিন্ন ধরণের গাছগাছড়া, এবং বন্য প্রানীর আবাসস্থল এ এলাকাটি। কিন্তু বর্তমানে মানুষের পরিবেশ বিরোধী আচরণ, পরিবেশ দূষণ, স্থলভাগের অপব্যবহার, এবং জলবায়ু পরিবর্তন সুন্দরবনের অস্তিত্বের জন্য বিশাল হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। নিয়ন্ত্রণবিহীন গাছপালা কেটে ফেলার কারণে বনাঞ্চলের আকৃতি ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে এবং বন্য পশুপাখীরা আবাসস্থল হারাচ্ছে। এ প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো সুন্দরবনের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত গুরুত্ব পর্যালোচনা করা এবং বনাঞ্চল নিধন এবং তার অবৈধ ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে কিছু যৌক্তিক সমাধান প্রস্তাব করা।

মূল শব্দগুলি: সুন্দরবন, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, ইকোলজিক্যাল ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, জলবায়ু পরিবর্তন,

ভূমিকা

সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ইকোলজিক্যাল সিস্টেমগুলোর মধ্যে একটি। সমুদ্রের উপকূলে বেড়ে ওঠা, লবণাক্ততা সহনশীল গাছপালা, জলাভূমি, এবং নদীনালার সমন্বয়ে গড়ে উঠা বিশাল সুন্দরবন হলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। গ্রীষ্ম এবং উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলী অঞ্চলের গরম ও আর্দ্র জলবায়ুর পরিবেশে বেড়ে ওঠা এ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলটি একটি উপকূলবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ইকোলজিক্যাল সিস্টেমের সৃষ্টি করেছে- যা অঞ্চলটির নিয়ত পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সাথে ভালোভাবে মানিয়ে নিয়েছে (Mukhopadthyay et.al., 2015) (Figure 1)।

Figure 1: The majestic and magnificent Sundarbans, Bangladesh. (A) An intricate web of forests, rivers, and channels, Credit: Tauhid Biplob, Wikimedia Commons (WC), 2018a; (B) Partially submerged Nipa palm in hightide, Credit: Ferdous, WC, 2014; (C) The mangrove flora, Credit: Syed Sajidul Islam, WC, 2016a.

এছাড়া এ বনাঞ্চল পরিবেশ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে শোষণ করে ও সঞ্চয় করে রাখে- যা পরিবেশ প্রতিরক্ষার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পাশাপাশি এ বনাঞ্চল স্থলভাগের ভাঙ্গন বা ক্ষয়কে প্রতিরোধ করে এবং শক্তিশালী ঝড় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে (Islam et.al., 2019)। উপকূলবর্তী অধিবাসীদের জীবন ধারণের জন্যও এ সামুদ্রিক বনাঞ্চল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বনাঞ্চলগুলোর পানিতে মাছ এবং শামুক জাতীয় (Shellfish) প্রাণীর প্রাচুর্য রয়েছে- যার বাণিজ্যিক মূল্য বিশাল। এছাড়া স্থানীয় মাছ শিকারেও এ বনাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদনেও রয়েছে এর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল স্থানীয় অর্থনীতি প্রবৃদ্ধিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বাড়িঘর নির্মাণের কাঠ, জ্বালানী এবং ঔষুধ উৎপাদনসহ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এ বনাঞ্চল একটা বিশাল ভূমিকা রাখে। সুন্দরবনের অর্থনৈতিক এবং ইকোলজিক্যাল বাস্তবতা, ঐতিহ্য বা প্রতিবন্ধকতাকে বুঝতে হলে এখানকার ভূ-তাত্ত্বিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভালোভাবে জানা অপরিহার্য। ইউনেস্কোর (UNESCO) ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ (World Heritage) এবং র‍্যামাসার সাইট (Ramsar site) হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার মধ্য দিয়ে সুন্দরবন পৃথিবীর ইকোলজিক্যাল গুরুত্বের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছে।

১৯৯২ সালে, র‍্যামসার কনভেনশনে জলাভূমিপূর্ণ (Wetland) সুন্দরবনের বাংলাদেশ অঞ্চলটিকে সারা বিশ্বে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকার গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে এ এলাকাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তার মধ্যে তিনটি অঞ্চলের ৩২,৪০০ হেক্টর এলাকাকে জীব-জন্তুর অভয়ারণ্য হিসেবে নির্বাচন করা হয়। কারণ এ তিনটি এলাকা কিছু বিলপ্তপ্রায় জীবজন্তুর মূল প্রজনন স্থান। ইউনেস্কোর ভাষ্য অনুযায়ী এখনো টিকে থাকা কয়েকটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের মধ্যে সুন্দরবন বৃহত্তম, যা জল ও স্থলভাগের জৈব বৈচিত্র্যের বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান উৎস। ১৯৮৭ সালে ভারতের অন্তর্ভূক্ত সুন্দরবন এলাকাকেও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এবং র‍্যামসার সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয় (Sundorbon Wetland, 2019)।

দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের পরিবেশের ক্ষতিকারক কার্যাবলীর কারণে সুন্দরবন এবং তার সংবেদনশীল ইকোলজিক্যাল সিস্টেম বিশাল হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এ কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে পরিবেশ

দূষণ, বনাঞ্চল ধ্বংস করা এবং সে কারণেই পরিবেশের বিরূপ পরিবর্তন (Saoun and Sarkar, 2024)। জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের উৎসগুলো ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যেমন: অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য বনাঞ্চল পরিষ্কার করে সেখানে কৃষিকাজ করা হচ্ছে, চিংড়ি মাছের চাষ করা হচ্ছে, গাছপালা কেটে ফেলে বাড়িঘর নির্মাণ করা হচ্ছে অথবা গাছপালা কেটে ফেলে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে (Islam and Bhuiyan, 2018)।

বর্তমানে সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ১০,০০০ বর্গ কি.মি.- যা সারা বিশ্বের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের শতকরা তিন ভাগ (Kanan et.al., 2023) অথচ ২০০ বছর আগে সুন্দরবনের আকৃতি ছিল ১৬,৭০০ বর্গ কি.মি. (World Heritage Data sheet, 1997)। এখান থেকেই প্রমাণিত হয়, আমাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের জন্য সুন্দরবন কীভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

এ পর্যবেক্ষণমূলক নিবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুন্দরবনের ভৌগোলিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা, এর বিশাল জৈব বৈচিত্র্য, অর্থনৈতিক ও ইকোলজিক্যাল তাৎপর্যের আন্তঃসম্পর্কগত বাস্তবতার উপর অনুসন্ধান করা, সুন্দরবন তার অস্তিত্ব রক্ষায় যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে যেমন: বনাঞ্চল ধ্বংস, প্রাকৃতিক উৎসগুলোর অপব্যবহার ও তা শনাক্তকরণ এবং এ তথ্য-উপাত্তগুলোর প্রেক্ষাপটে সমাধানের আলোচনা করা।

ভৌগলিক অবস্থান

সুন্দরবন একটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সমৃদ্ধ বিশাল ব-দ্বীপ এলাকা। এটি গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) এবং মেঘনা নদীর মিলনস্থানে অবস্থিত এবং এখান থেকেই নদীগুলোর পানি সমুদ্রে প্রবেশ করে। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, যেটি ২১°৩০′- ২১°৩০′ উত্তর দিকে এবং ৮৯°০০′- ৮৩°৫৫′ পূর্ব দিকে অবস্থিত (Rahman et.al., 2015)। সুন্দরবন বাংলাদেশ থেকে প্রসারিত হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তারিত। প্রায় ৬২% বনাঞ্চল বাংলাদেশে অবস্থিত (৬,২০০ বর্গ কি.মি.) এবং অবশিষ্ট ৩৮% ভাগ (৩,৮০০ বর্গ কি.মি.) ভারতে অবস্থিত (Ghosh et.al., 2015) (Figure 2)।

Figure 2: The map of the Sundarbans, Credit: Nirvik 12, WC, 2015.

সুন্দরবনের ইকোলজি

সুন্দরবন জলাভূমি ও নদী-নালা সমৃদ্ধ, এবং ভাটার সময় পানি সরে যাওয়া (Mud-flat) একটি অঞ্চল, যেখানে জলাভূমি ও নদীনালার একটি জটিল নেটওয়ার্কের সৃষ্টি হয়েছে। জোয়ার-ভাটার কারণে এ ব-দ্বীপ এলাকাটি নিয়ত পরিবর্তনশীল, যে কারণে প্রতিনিয়ত এলাকাটির নতুন অবকাঠামো তৈরি হয়। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুন্দরবনে একটি অত্যন্ত আর্দ্র ট্রপিকাল এবং সাব-ট্রপিকাল জলবায়ু বিদ্যমান, যার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১,৯২০ মি.মি. এবং তাপমাত্রা সাধারণত ২১°C থেকে ৩০°C এর মধ্যে থাকে। মৌসুমী বর্ষাকাল সাধারণত মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিস্তৃত (Rahman et al., 2009)। বালেশ্বর, পশুর, রাইমঙ্গল, এবং শিবসা এখানে প্রধান নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম- যা মিষ্টি পানির প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করে। সুন্দরবনের জোয়ার-ভাটা একটি অর্ধ-দৈনিক চক্র অনুসরণ করে, এখানে প্রতিদিন দুবার জোয়ার এবং দুবার ভাটা সংগঠিত হয় (Bandyopadhyay, 2019)। বনাঞ্চলটি তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত: জোয়ার-ভাটা জলপথ (Tidal waterways), ম্যানগ্রোভ বন (Mangrove Forest), এবং পশ্চাৎভূমি (Hinterland)।

জোয়ার-ভাটা জলপথ

সুন্দরবনের জোয়ার-ভাটার জলপথগুলো নদীনালা বা খালের একটি জটিল সমন্বয় এবং এগুলো সুন্দরবনের প্রাণ। পানি প্রবাহের এ পথগুলো প্রতিদিন জোয়ার-ভাটার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এখানে একটি অনবদ্য ইকোলজিক্যাল সিস্টেমের সৃষ্টি করেছে। এখানে নদীগুলোর মিঠাপানি বঙ্গোপসাগরের নোনা পানির সাথে মিশে এবং জোয়ার-ভাটার ওঠানামার কারণে এলাকাটিতে একটি পলিমাটির অবকাঠামো তৈরি করে- যা এখানে বসবাসকারী জৈব-বৈচিত্র্যের অস্বিত্বের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল

সুন্দরবনের গাছপালার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা লবণাক্ত পানি (Brackish water) সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে। এখানে অনেক প্রজাতির গাছপালা রয়েছে। এ গাছগুলো উপকূলবর্তী স্থলভাগের ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা তৈরি করে, মূল ভূখণ্ডকে সাইক্লোন এবং সামুদ্রিক ঝড় থেকে প্রতিরক্ষা দেয় এবং বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য (Flora and fauna) রক্ষায় সহায়তা করে।

পশ্চাৎবর্তী স্থলভাগ

ম্যানগ্রোভ গাছপালার বাইরেও সুন্দরবন এলাকায় রয়েছে স্বল্প উচ্চতার দ্বীপ, কর্দমাক্ত প্রান্তর, ও লবণাক্ত পানির এলাকা। প্রতিনিয়ত জোয়ার-ভাটা এবং নদীগুলোর বয়ে নিয়ে আসা পলিমাটির কারণে এ এলাকাগুলোর আকার ও প্রকৃতি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ এলাকাগুলি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, উভচর, এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের জীবন ধারনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

সুন্দরবনের উদ্ভিদ

মূল বনাঞ্চলগুলো সুন্দরবনের কেন্দ্রে অবস্থিত যা জোয়ার-ভাটা পরিবেশের (Intertidal zone) সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এ গাছগুলো জোয়ার-ভাটার প্রতিনিয়ত চাপকে সাফল্যের সাথে প্রতিহত করে এবং সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ও নদীর মিঠাপানির সংমিশ্রণ এলাকায় সুষম ভারসাম্য বজায় রেখে বেঁচে থাকে। সুন্দরবনে এখন পর্যন্ত ৩৩৪ ধরনের বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালার সন্ধান পাওয়া গেছে (Prain, 1903)। পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এখানে ২৩০ প্রজাতির ফ্লোরাল উদ্ভিদ (Siddiqui, 2016) এবং ৫২৮ প্রজাতির ভাস্কুলার উদ্ভিদের (Rahman, et al., 2015) সন্ধান পাওয়া গেছে। সুন্দরবনের গাছপালার মধ্যে সুন্দরী (*Heritiera fomes*), গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), গরান (*Ceriops decandra*), পশুর (*Xylocarpus mekongensis*), কেওড়া (*Sonneratia apetala*) এবং খোলসা (*Aegiceras corniculatum*) অন্যতম (Rahman, 2000)।

দর্শনীয় সুন্দরী গাছগুলোর (Figure 3A) নামকরণ করা হয়েছে সম্ভবত সুন্দরবনের নাম থেকেই। এ গাছগুলো সাধারণত লম্বা হয় এবং তাদের শ্বাসমূলগুলো (Pneumatophores) মাটির এবং পানির সীমানার উপর বিস্তৃত থাকে। এ শ্বাসমূলের সাহায্যে গাছগুলো অ্যানারবিক মাটিতে (Anaerobic soil) জন্মেও প্রকৃতির সাথে বায়বীয় উপাদান (Respiratory gas) বিনিময় করতে পারে। এ গাছের কাঠ খুবই উন্নতমানের তাই বছরের পর বছর ধরে এ গাছের অবৈধ নিধন চলছে। গেওয়া গাছের (Figure 3B) বিশদ মূলগুলো লবণাক্ত পানির গভীরে বিস্তৃত থাকে। এ গাছগুলোতে অসংখ্য পাখি বাসা বাঁধে। অন্যদিকে ছোট আকৃতির গরান গাছগুলোর জটিল ও ঘন শিকড় উপকূলবর্তী মাটির ভাঙ্গনকে প্রতিহত করে এবং পশ্চাৎবর্তী স্থলভাগকে সাইক্লোন এবং জোয়ার-ভাটার প্রাবল্য থেকে রক্ষা করে।

Figure 3: (A) The Sundari, Credit: Sarangib, WC, 2016b; (B) Gewa trees, Credit: Vengolis, W.C. 2013.

এ বিশেষ ধরনের গাছগুলো ছাড়াও সুন্দরবনে প্রচুর গাছপালা আছে যেগুলো লবণাক্ত পানিতে টিকে থাকতে পারে। যেমন, নিপা পাম (*Nypa fruticans*), আঞ্চলিক ভাষায় এগুলোকে গোলপাতা বলা হয়; ম্যানগ্রোভ ডেট পাম (*Phoenix paludose*), যার আঞ্চলিক নাম হেতাল; টাইগার ফার্ন (*Acrostichum aureum*), এবং কাঁকড়া (Kankra) (*Bruguiera gymnorhiza*)- এরা প্রত্যেকে এ ইকোসিস্টেমকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

সুন্দরবনের প্রাণী

সুন্দরবন একটি বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ বনাঞ্চল। এখানে প্রায় ৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৫০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৮ প্রজাতির উভচর, ৪০০ প্রজাতির মাছ, এবং ৩২০ প্রজাতির পাখি রয়েছে- যাদের মধ্যে পরিযায়ী পাখিরাও অন্তর্ভুক্ত (Acharja, 2024)। এ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের সবুজ আচ্ছাদনের নিচে প্রচুর প্রাণীর বাস- যারা এ এলাকার বিচিত্রতা এবং প্রতিকূলতার মাঝে শিকার বা শিকারীর ভূমিকায় নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার (*Panthera tigris*) (Figure 4A) যারা এ বনের সর্বোচ্চ শিকারী প্রাণী (Apex predator) এবং এদেরকে সুন্দরবনের আত্মাও বলা হয়। সুন্দরবনের সর্বত্র এদের গতিবিধি। এছাড়া অন্যান্য আকর্ষণীয় প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে, চিতল হরিণ (*Axis axis*) (Figure 4B), সামুদ্রিক কুমির (*Crocodylus porosus*) (Figure 4C), ইরাবতি ডলফিন (*Orcaella brevirostris*) (Figure 4D), মাডস্কিপার (*Periophthalmus spp.*), মেছো বিড়াল (*Prionailurus viverrinus*) এবং অজগর সাপ (*Python molurus*)। এছাড়া বনাঞ্চলটি বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রজনন স্থান।

২০১৫ সালের জুন মাস থেকে ২০১৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সুন্দরবন এলাকায় ৩২২ ধরনের মাছের প্রজাতি আছে (Habib et al., 2020)- যা এখানে অসংখ্য জেলেকে তাদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

সুন্দরবন ৩০০ প্রজাতির ও বেশি পাখির আবাসস্থল। এদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাপী বিপন্ন কালামুখ প্যারাপাখি (Masked Finfoot) (*Heliopais personata*) এবং রাজকীয় সাদাপেট সামুদ্রিক ঈগল (White-bellied sea eagle) (*Haliaeetus leucogaster*)।

Figure 4: (A) The Royal Bengal Tiger, Credit: Charles J. Sharp, WC, 2020a; (B) Spotted deer, Credit: Charles J. Sharp, WC, 2018b; (C) Estuarine crocodiles, Credit: Bernard Dupont, WC, 2020b; (D) Irrawaddy dolphins, Credit: Dan Koehl, WC, 2011.

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের এবং ভারতের সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সুন্দরবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লক্ষ লক্ষ স্থানীয় জনসাধারণ মাছ ধরা, কাকঁড়া, মধু, ওষধি গাছ, জ্বালানী কাঠ, কাঠ, এবং গৃহনির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল (Rahman, 2009)। ২০১৮ সালে, বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুন্দরবনে মাছ ধরা, কাঠ, জ্বালানী কাঠ এবং মধু সংগ্রহ থেকে যথাক্রমে ০.২-৩৫৬, ০.৪, ০.০৬-২৯, এবং ০.০১১-১৯.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ উপার্জিত হয় (The World Bank, 2018)। একটি সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে জানা যায় যে, সুন্দরবনের প্রতি হেক্টর থেকে মধু, মোম, কাঠ, জ্বালানী কাঠ, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, ওষধি গাছ ও পশুখাদ্য থেকে যথাক্রমে: ৪১.৪০, ১১.১২, ৩১.২৪, ১৯.৬৫, ১৩.০৬, ২৩.৪০, ৫৬.০৯ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ উপার্জিত হয় (Kanan et al., 2024)।

২০২০ সালে, বাংলাদেশ পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুন্দরবন এলাকার প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন জনসাধারণ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক উৎসগুলো থেকে জীবন ধারণ করে। কিন্তু বর্তমানে এ এলাকা বড় ধরণের সামাজিক ও পরিবেশগত হুমকির সম্মুখীন। দরিদ্র্যতা, স্থলভাগ ব্যবহারের সীমিত অধিকার, বিশুদ্ধ পানির অভাব, বিদ্যুৎ শক্তির অপর্যাপ্ততা, বাড়িঘরের সমস্যা, স্বাস্থ্য সেবা সমস্যা, সীমিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং জীব বৈচিত্র্যের হ্রাস বর্তমানে সুন্দরবনের প্রধানতম সমস্যা (Circular Conservation, 2020)।

মাছ ধরা, বনায়ন এবং ইকোট্যুরিজম খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে বনাঞ্চল ধ্বংসকারী কৃষিকাজ ও এ্যাকুয়াকালচার এর উপর স্থানীয় নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। এছাড়া, স্থানীয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত জ্ঞান, এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা অনুশীলনগুলো স্থানীয় জনগণকে সাইক্লোন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় সহায়তা করবে।

মাছ উৎপাদন

সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক গুরুত্ব হচ্ছে মাছ উৎপাদন। ম্যানগ্রোভ বনের নদী, শাখানদী ও খালগুলো অসংখ্য প্রজাতির মাছ, চিংড়ি এবং কাঁকড়ার জন্য আদর্শ প্রজনন স্থান হিসেবে কাজ করে। স্থানীয় জেলেরা তাদের জীবিকার জন্য এ মাছ সম্পদের প্রাচুর্যের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। সুন্দরবন বাংলাদেশের মাছ উৎপাদনে যথেষ্ট অবদান রাখে- যা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের পরেও রপ্তানি আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে। উল্লিখিত ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত রিপোর্ট ছাড়াও ২০১৮ সালে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, ২০১৭ সালে মাছ রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ ২১৬,৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের অর্থ আয় করেছে (Rahman et.al., 2018)।

কাঠ এবং কাঠ-নিরপেক্ষ বনজ সম্পদ

সুন্দরবনের কাঠ এবং কাঠ-নিরপেক্ষ বনজ সম্পদ স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে। টেকসই কাঠ সংগ্রহ বেশিরভাগই নিয়ন্ত্রিতভাবে হয়। তবে মধু, মোম, ঔষধি গাছ এবং গৃহনির্মাণ সামগ্রীর সংগ্রহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনিয়ন্ত্রিত। কারণ তা স্থানীয় লোকজন তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে সংগ্রহ করে। এ বনজ পণ্যগুলো সুন্দরবনের আশেপাশে বসবাসকারী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ করে দেয় ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং গ্রামীণ উন্নয়নে অবদান রাখে। বিশ্বব্যাংক প্রণোদিত ২০১৮ সালের রিপোর্টে, এবং Kannan et al.-এর ২০২৪ সালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে সুন্দরবনে সংগৃহিত জ্বালানী কাঠ এবং মধুর আনুমানিক বার্ষিক মূল্যায়ন সম্পর্কে ইতিঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

পর্যটন

সুন্দরবনের অনন্য ইকোসিস্টেম, জীববৈচিত্র্য, এবং আকর্ষনীয় ভূ-বিন্যাস (Landscape) ও প্রাকৃতিক দৃশ্য, সারা বিশ্বের পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করছে। সরকার এবং স্থানীয় কমমিউনিটির জন্য ইকোট্যুরিজম একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় আয়ের উৎস হিসেবে দেখা দিয়েছে। পর্যটন ক্রিয়াকলাপ, যেমন বন্যপ্রাণী সাফারি, পাখি পর্যবেক্ষণ, গাইডেড ট্যুর, আতিথেয়তা পরিসেবার, এবং বন অন্বেষণ প্রবেশ ফির মাধ্যমে সম্ভাবনাময় রাজস্ব তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া ইউনেস্কোর সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এবং র‍্যামসার সাইট ঘোষণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে এর আবেদন অনেক বেড়েছে- যা পর্যটনের অর্থনৈতিক অবদানকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বাংলাদেশে সুন্দরবনের পর্যটন থেকে আনুমানিক বার্ষিক আয় প্রায় ৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (Nobi et al., 2021)।

ইকোসিস্টেমের পরিসেবা মূল্য (Ecosystem Service Value)

গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ম্যানগ্রোভ গাছগুলো অসাধারণ দক্ষতার সাথে পরিবেশ থেকে কার্বন শোষণ করে- যার বিশ্বব্যাপী আনুমানিক বার্ষিক আর্থিক মূল্য হেক্টর প্রতি আনুমানিক ১৯৪,০০০ মার্কিন ডলার এবং বিশ্বব্যাপী ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলগুলো প্রতি বছর আনুমানিক ২.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের পরিসেবা প্রদান করে থাকে (Uijttewaal, 2021)। ১৯৭৫, ২০০০, এবং ২০২০ সালে সমগ্র সুন্দরবনের (বাংলাদেশ ও ভারত) মোট ইকোসিস্টেম পরিসেবার আনুমানিক মূল্য ছিল যথাক্রমে ২৭,৪৫০, ২৬,৬৬৬, এবং ২৮,১৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দুঃখজনক হলেও সত্য ১৯৭৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ইকোসিস্টেম পরিসেবা মূল্যের আনুমানিক মোট ক্ষতি হয়েছে ৩,৩১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (Bera et al., 2022)। এছাড়া আগে উল্লেখ করা হয়েছে সুন্দরবন ঝড়ের বিরুদ্ধে উপকূলীয় প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো হ্রাস করে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে। এ বনসম্পদ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধের মাধ্যমে উপকূলকে স্থিতিশীল রাখে, কৃষি জমি রক্ষা করে এবং মানুষের বসতি এবং অবকাঠামোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে। যদিও এই ইকোসিস্টেম

পরিসেবাগুলোর সঠিক অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা কঠিন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে উপকূলীয় স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশ্নাতীত।

ইকোলজিক্যাল তাৎপর্য

বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এবং ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ও রামসার সাইট হিসাবে, সুন্দরবন একটি প্রাকৃতিক বিস্ময় যা আমাদেরকে অমূল্য ইকোসিস্টেম পরিসেবা দিয়ে আসছে।

কার্বন শোষণ এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ

প্রাকৃতিক কার্বন শুষে নিয়ে এবং তা তাদের শরীরে জমা রেখে সুন্দরবন বনাঞ্চলের গাছপালা জলবায়ু ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ম্যানগ্রোভ বন বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নিয়ে তা তাদের শরীরে এবং সংলগ্ন মাটিতে দক্ষতার সাথে সংরক্ষণ করে। ফলে এরা পরিবেশে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ কমাতে, বিশ্বের তাপমাত্রা স্থিতিশীল করতে, এবং পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণে সাহায্য করে। বনজ গাছপালা এবং মাটি উভয়ের মধ্যেই কার্বন সঞ্চিত থাকে। বনজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ ($6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং তা কার্বোহাইড্রেট, সেলুলোজ এবং অন্যান্য জৈব কার্বনে রূপান্তরিত করে- যা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে সংরক্ষিত হয়। মাটির উপরে থাকা গাছের কাণ্ডের শক্ত কাঠের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্বন (৬৩-৭৭%) সঞ্চিত থাকে। গাছের পাতা, ঝরা পাতা, এবং মাটিতে সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ প্রায় ৪৮% (Webber, 2024)। ২০০৯-২০১০ সালের মধ্যে পরিচালিত বাংলাদেশ বন বিভাগের একটি সমীক্ষা অনুমান করেছে যে, সুন্দরবনের বাংলাদেশের অংশে ৪১১,৬৩৯ হেক্টর বনাঞ্চলে ৩৮৭.৭ মেগাটন কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ১০৫.৬ মেগাটন কার্বন সঞ্চিত রয়েছে (BD Forest Dept., 2024)।

২০১৫ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিভিন্ন গাছপালা এবং মাটির লবণাক্ততা ভেদে সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হয়। সুন্দরী- যা বনের প্রভাবশালী উদ্ভিদ; অন্যান্য গাছপালার তুলনায় বেশি কার্বন (প্রতি হেক্টরে ৩৬০.১ ± ২২.৭১ মেট্রিক টন) সঞ্চয় করে। মিঠাপানির বনাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি কার্বন (প্রতি হেক্টরে ৩৩৬.০৯ ± ১৪.৭৪ মেট্রিক টন) সঞ্চিত রয়েছে, তারপরে মাঝারি এবং বেশি লবণাক্ত অঞ্চলে কার্বন সঞ্চয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমেছে (Rahman et al., 2015)। সুন্দরী, বাইন, কেওড়া এবং গেওয়া গাছের গড় কার্বন সঞ্চয় ক্ষমতা, যথাক্রমে: ৪১.৩ শতাংশ, ৪০.৭১ শতাংশ, ৪০.৬৮ শতাংশ এবং ৩৯.০৬ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরন্তু, অল্প বয়স্ক এবং দ্রুত বর্ধনশীল বনগুলো বেশি কার্বন সিকোয়েস্টেশন ক্ষমতা দেখিয়েছে (Datta et al., 2021)।

ঘূর্ণিঝড় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে প্রাকৃতিক বাধা হিসাবে উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধ্বংসাত্মক ঝড়গুলো প্রবল বাতাস, মুষলধারে বৃষ্টি এবং জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে- যা মানুষের জীবন, সম্পত্তি এবং জীবিকার জন্য উল্লেখযোগ্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। এ দুর্যোগের সময় সুন্দরবন একটি

প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা প্রদান করে এবং দুর্যোগ ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ থেকে উপকূলীয় অঞ্চলকে সুরক্ষা দেয়।

ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ নোনা জলের পরিবেশে বড় হয়। তারা উপকূল অঞ্চলের মাটিতে তাদের জটিল শিকড় প্রসারিত করে। সময়ের সাথে সাথে এ শিকড়গুলো একত্রিত হয়ে একটি ঘন নেটওয়ার্ক তৈরি করে- যা পলিমাটিকে ধরে রাখে এবং সমুদ্রের ঢেউ ও উপকূল রেখার মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা তৈরি করে (Newcomb, 2024)। সুন্দরবনের ঘন ম্যানগ্রোভ গাছপালাও একইভাবে তাদের ঘন শিকড় এবং বিস্তৃত ডালপালার সাহায্যে ঝড় এবং জলোচ্ছাস থেকে উপকূলকে রক্ষা করে। বনের গাছপালা জলোচ্ছাসের শক্তি শুষে নেয়- যার ফলে মূল ভূখণ্ডে পৌঁছানোর আগে ঢেউয়ের উচ্চতা এবং তীব্রতা হ্রাস পায়। এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উপকূলীয় মাটির ক্ষয় কমাতে, নিচু এলাকার জলাবদ্ধতা রোধ করতে, এবং উপকূলীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং মানুষের বসতি রক্ষা করতে সাহায্য করে।

সাধারণভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে, বিশেষত বঙ্গোপসাগরের সাইক্লোনগুলোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকার প্রতিরক্ষা অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপক্ষে এ বনাঞ্চল একটা শক্তিশালী প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা দেয়।

এ বিধ্বংসী ঝড়গুলো বয়ে নিয়ে আসে শক্তিশালী ঝড়োবাতাস, প্রবল বর্ষণ। ফলে উপকূলবর্তী বাসিন্দাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। বনাঞ্চলের গাছগুলোর ঘন মূল এবং ডালপালাগুলো একটা বিশাল প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে। বনাঞ্চলটি এগিয়ে আসা সাইক্লোনের তীব্র গতি ও শক্তিকে মূল ভূখণ্ডে পৌঁছানোর আগেই দুর্বল করে ফেলে। এ প্রতিরক্ষা উপকূলবর্তী ভাঙ্গনকেও অনেকটা প্রতিহত করে; নিচু অঞ্চলগুলোকে প্রবল বন্যা থেকে অনেকাংশে রক্ষা করে এবং উপকূলবর্তী এলাকার গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃযোগাযোগ ও জনবসতি রক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে।

ঝড়োবাতাসের শক্তি শোষণ

ঘূর্ণিঝড়ের সময় ম্যানগ্রোভের বিস্তৃত ডালপালার ক্যানোপি কভার এবং ঘন গাছপালা ঝড়ের বায়ু শক্তি শুষে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ম্যানগ্রোভ গাছের বিস্তীর্ণ শাখাগুলো বনের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের বাতাসকে মন্থর করে- যা উপকূলীয় মানুষের আবাসস্থল, নৌকা এবং অন্যান্য কাঠামোর ধ্বংসকে প্রতিরোধ করে। বায়ু শক্তিকে দুর্বল করে দিয়ে সুন্দরবন মানুষের ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানি কমাতে সাহায্য করে। গত দুই দশকে সুন্দরবন বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ২০০৭ সালে *সিডর* (Sidr), ২০০৯ সালে *আইলা* (Aila), ২০১৩ সালে *ফাইলিন* (Phailin), ২০১৪ সালে *হুদহুদ* (Hudhud), ২০১৯ সালে *ফণী* (Fani), ২০১৯ সালে *বুলবুল* (Bulbul), ২০২০ সালে *আম্ফান* (Amphan), ২০২১ সালে *ইয়াস* (Yaas) (Ghosh and Mistri, 2023), এবং ২০২৪ সালের সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় *রেমাল* (Remal)। সুপার সাইক্লোন সিডর সুন্দরবনের প্রায় ৪০% ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং আনুমানিক $১৪২.৯ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি করেছে (Saadi, 2010; Khan et al., 2021)। সুন্দরবনের বনভূমি বাতাসের শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে কাজ না করলে ঘূর্ণিঝড়গুলোর প্রভাব আরও বেশি বিধ্বংসী হতে পারত।

সংরক্ষণ মূল্য (Conservation Value)

সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম হ্যালোফাইটিক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এবং এটি WWF (ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড) গ্লোবাল ২০০ ইকো-রিজিয়নের সাথে সংযুক্ত। ডাব্লুডাব্লিউএফ গ্লোবাল ২০০ ইকো-রিজিয়ন প্রকল্পটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সুনির্দিষ্ট স্থলজ, মিঠাপানি এবং সামুদ্রিক অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত এবং পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যকে পর্যবেক্ষণ করে। এ চিহ্নিত অঞ্চলগুলো পৃথিবীর প্রধানতম ইকোসিস্টেমগুলোর উদাহরণ হিসাবে কাজ করে। সুন্দরবনের অভয়ারণ্য এবং এর আশেপাশের অঞ্চলগুলোকে ইউনেস্কো বায়োস্ফিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছে (Pletcher, 2024)।

আগেই বলা হয়েছে, রামসার জলাভূমি এবং ইউনেস্কো বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হিসেবে সুন্দরবনের স্বীকৃতি রয়েছে। এ সুরক্ষিত এলাকার মধ্যেই রয়েছে টাইগার রিজার্ভ, ন্যাশনাল পার্ক এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ডেটাশিট, 1997)। এ তথ্যগুলো থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের জন্য সুন্দরবন বিশ্বে আজ তার একটি স্বতন্ত্র স্থান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এ বন অনেক প্রাণ-প্রজাতির বাসস্থান। বিশেষ করে এ বনে বাস করে বিপন্ন প্রজাতির বাঘ রয়েল বেঙ্গল টাইগার, স্পটেড হরিণ, বন্য শূকর, রিসাস বানর, অসংখ্য প্রজাতির পাখি এবং অনেক প্রজাতির মাছ। উপরন্তু, এ বন অজগর সাপ এবং নোনা পানির কুমিরের মতো অসংখ্য বিপন্ন সরীসৃপের আবাসস্থল (UNESC O, 2024)।

বনের শীর্ষ শিকারি (Apex predator) হওয়ায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার হরিণ এবং বন্য শুয়োরের মতো তৃণভোজী প্রাণীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও এ অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু, ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের শিকড়ের জটিল নেটওয়ার্ক বিভিন্ন সামুদ্রিক ও স্থলজ প্রজাতির জন্য আবাসস্থল এবং প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে- যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অবদান রাখে। সুন্দরবন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত প্রক্রিয়ারও প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন: মৌসুমী বৃষ্টি, বন্যা, ব-দ্বীপ গঠন, জোয়ার- ভাটা প্রভাব এবং উদ্ভিদ উপনিবেশ গঠন।

সুন্দরবনের ক্রমান্বয় অবক্ষয় এবং বাংলাদেশের উপর এর প্রভাব

মানুষের তৈরি কিছু প্রকৃতি বিরোধী কাজ এবং তা থেকে উদ্ভুত সমস্যার কারণে সুন্দরবনের ম্যাংগ্রোভগুলো আজ বিপন্ন। এ ক্রিয়াকলাপ এবং তার ফলশ্রুত সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে বন্য-প্রজাতির আবাসস্থল ধ্বংস, পরিবেশ দূষণ, অস্থিতিশীল মাছ ধরা, বন উজাড়, চোরাচালান, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন। এসব কারণে সুন্দরবনের অখণ্ডতা দ্রুত নষ্ট হচ্ছে। চোরা-শিকারিরা বন্যপ্রাণীর শরীরের মূল্যবান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য বাঘ হত্যা করে এবং সে অঙ্গ-প্রতঙ্গ অবৈধ বন্যপ্রাণীর বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয় । অন্যদিকে হরিণ, উদবিড়াল, এবং কুমিরের মতো প্রাণীরা তাদের চামড়া, মাংস এবং শরীরের অন্যান্য অংশের জন্য শিকারে পরিণত হয়। এ নির্বিচার হত্যা বনের নাজুক ইকোলজিক্যাল ভারসাম্যকে ব্যাহত করে এবং বন্য প্রজাতির বেঁচে থাকাকে বিপন্ন করে।

১৯৭৫ থেকে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ল্যান্ডস্যাট চিত্র (Landsat imagery) ব্যবহার করে একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, সুন্দরবনের প্রায় ৫.৯ শতাংশ বনভূমি ক্ষয় হয়েছে। ১৯৭৭ এবং ১৯৮৮ সালের তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবনের প্রায় ১৯.৩ শতাংশ হ্রাস পায় এবং ঘন বনের প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ

ক্ষতি থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য ২৫ বছরেরও বেশি সময় লেগেছে। গবেষণায় আরও জানানো হয়েছে যে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য মিঠা পানির প্রবাহের উপর নির্ভরশীল এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এর ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা এবং তৎপরতা বেড়েছে- যা সুন্দরবনের নদীনালায় পানির লবণাক্ততা বাড়াতে পারে (Islam, 2014)।

অবৈধভাবে গাছ কাটা এবং বন উজাড়, কৃষি ও উন্নয়নের জন্য জমি পরিষ্কার করা- এ ধরনের আচরণ, বনের সূক্ষ্ম ইকোসিস্টেমকে নষ্ট করে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের ক্ষতি, এর জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে লড়াই করার এবং উপকূলীয় অঞ্চলগুলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতাকে দুর্বল করে; এবং অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থলকে ধ্বংস করে তাদেরকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয়। নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে। শিল্পবর্জ্য, তেল-স্পিল এবং কঠিন বর্জ্য থেকে দূষণ বনের জলাশয় এবং মাটিকে দূষিত করে এবং জলজ জীবন এবং ম্যানগ্রোভ গাছপালাকে বিপন্ন করে। রাস্তা, বাঁধ এবং বসতি নির্মাণের কারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বিভক্ত হয়; বন্যপ্রাণীর যাতায়াতের পথকে ব্যাহত করে, এবং প্রাণীদেরকে বিচ্ছিন্ন করে জীববৈচিত্র্য নষ্ট করে।

এসব হুমকির কারণে এই ভঙ্গুর ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য বিপন্ন হচ্ছে। দারিদ্র্য, দুর্নীতি, দুর্বল আইন প্রয়োগ, অপর্যাপ্ত জ্ঞান ও নীতিবোধ, এবং জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে সুন্দরবনের সংরক্ষণ প্রচেষ্টা স্থবির হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ: সুন্দরবনের ১৪ কিলোমিটার উত্তরে রামপালে একটি কয়লা-চালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ- যা রামসার কনভেনশন এবং ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটগুলোর জন্য ইউনেস্কোর নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য সমালোচিত হয়েছে। এ স্থাপনা সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত মূল্যবোধকে বিপন্ন করে। অধিকন্তু, বাধাপ্রাপ্ত মিঠাপানির প্রবাহের কারণে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১৯৭৫ সালে ভারত কর্তৃক ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের কারণে গঙ্গা নদীর মিঠাপানির নিষ্কাশন ১৯৬২ সালে ৩,৭০০ m^3/s থেকে ২০০৬ সালে মাত্র ৩৬৪ m^3/s-এ নেমে এসেছে (Islam and Gnauck, 2008)।

এ বিপুল পরিমাণ পানি সরবরাহের হ্রাস সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমের জন্য একটা ভয়ঙ্কর বিপদ-সংকেত। এ কারণে বনাঞ্চলে লোনাপানির অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং বনাঞ্চলের ইকোলোজির ওপর তার প্রভাব পড়ছে। গঙ্গার বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও বন্যপ্রানীদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে (Jahan, et al, 2017)। পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের সুন্দরবনের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় (এটি সুন্দরবনের মূল এলাকা) মাছ উৎপাদন এবং বহুমুখী কৃষি ব্যবস্থা ক্রমশ কমে যাচ্ছে (Gain and Giupponi, 2014)। এ বাধের কারণে বাংলাদেশের প্রায় প্রধান নদী-পানির ইকোলজি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাছাড়া সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকায় সমুদ্রের পানির উচ্চতা ক্রমশ বাড়ছে; বছরে ৩.৯০±০.৪৬ মি.মি. হারে। গঙ্গা নদীর পানিপ্রবাহ কমে যাওয়া এবং সুন্দরবনের কাছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বনাঞ্চলের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ঝুঁকি অনেক বেড়ে গিয়েছে। হিসেব বলছে, সমুদ্রের উচ্চতা ১ মিটার বাড়লে ম্যানগ্রোভ এলাকার ৪০-৬০ শতাংশ বিলীন হয়ে যেতে পারে। উপরন্তু, ঘূর্ণিঝড়ের বেড়ে যাওয়া প্রভাব ও তৎপরতা সুন্দরবনের স্থিতিশীলতাকে আরও হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

উপসংহার

২০০৪ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে সুন্দরবনের বনাঞ্চলের পরিমাণ গড়ে বার্ষিক ২.৬৬ শতাংশ হারে কমে এসেছে। প্রাথমিকভাবে এর কারণ বন উজাড় এবং বনভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন (Saoum and Sarkar, 2024)। পরিবেশগত তাৎপর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, সুন্দরবনের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় এবং ক্ষতি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের কারণ। সুন্দরবনের ইকোলজি বিশ্বের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ইকোলজিগুলোর মধ্যে একটি। এটি অসংখ্য উদ্ভিদ এবং প্রাণীর আশ্রয়স্থল- যার মধ্যে অনেকগুলো প্রজাতি অনন্য এবং বিপন্ন। আবাসস্থল অদৃশ্য হওয়ার ফলে অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটবে, পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং জীবজগতে জেনেটিক বৈচিত্র্য হ্রাস পাবে। উপরন্তু, সুন্দরবন কার্বন সংরক্ষণ, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং উপকূলীয় প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বনাঞ্চল ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো আরও খারাপ আকার ধারণ করবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে এবং উপকূলীয় অঞ্চলগুলো আরো বেশি পরিমাণে ক্ষয় ও বন্যার ঝুঁকিতে থাকবে। কার্বন সিঙ্ক হিসাবে কাজ করার ফলে সুন্দরবন জলবায়ু স্থিতিশীলতায় সহায়তা করে, ফলে পরোক্ষভাবে ঘূর্ণিঝড়ের মতো চরম আবহাওয়া জনিত ঘটনাগুলোর তৎপরতা এবং তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে।

অর্থনৈতিকভাবে সুন্দরবন বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য। মাছ, পর্যটন, বনায়ন এবং কৃষির মতো সেক্টরগুলো এ ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের উপর অনেক বেশি নির্ভর করে। সুন্দরবন বিলুপ্ত হলে এসব খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে ফলে লাখ লাখ মানুষের জীবন জীবিকার ক্ষতি হবে। সবচেয়ে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি হওয়ায় বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়, প্রবল বৃষ্টি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে সুন্দরবনের ওপর নির্ভর করে। এটি ছাড়া উপকূলীয় ক্ষয়, বন্যা এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের ঝুঁকি বাড়বে- যা জনসংখ্যার স্থানচ্যুতি ঘটাবে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে বাড়াবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবকে আরো বাড়িয়ে তুলবে।

বৈশ্বিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও, এই বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বনের ইকোলজি আজ মানুষের অস্থিতিশীল কর্মকান্ড এবং দূষণের ফলে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। বনের পরিবেশগত অখণ্ডতা এবং জীববৈচিত্র্য আজ বিপন্ন। স্থানীয় জনজীবনের উপরও এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। কারণ তারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বন সম্পদের ওপর নির্ভর করে। আদিবাসী মানুষ- যারা খাদ্য, ওষুধ এবং আশ্রয়ের জন্য বনের ওপর নির্ভর করে তারা বন সংকোচন এবং বন সম্পদ হ্রাসের কারণে অসমভাবে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া, পরিবেশগত ক্ষতির কারণে ইকোট্যুরিজম ব্যবস্থার অবক্ষয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আয়ের বিকল্প উৎস থেকে বঞ্চিত করতে পারে এবং তাদেরকে আরও দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বনের চলমান সংরক্ষণ প্রচেষ্টাগুলো অকার্যকর এবং দুর্বল আইন প্রয়োগ, দুর্নীতি, দারিদ্র্য এবং সচেতনতার অভাবসহ অসংখ্য কঠিন সব বাধার সম্মুখীন। বর্ধিত বন-পাহারা, সঙ্গত সংরক্ষণ কর্মসূচি, জনসচেতনতামূলক প্রচারণা এবং টেকসই জীবিকা প্রকল্পের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে এ সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার জন্য সংরক্ষণ সংস্থা, সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা অপরিহার্য। সমস্যাগুলোর ব্যাপ্তি এবং জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এবং তাদের মূল্যবান

জীববৈচিত্র্যকে কার্যকরভাবে রক্ষা করার জন্য আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন।

সুন্দরবন সংরক্ষণ শুধু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্যই নয়, এর সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশগত ঐতিহ্য রক্ষার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এই বনাঞ্চলের সঠিক মূল্যায়ন করে এবং এর সংরক্ষণে বিনিয়োগ করে বাংলাদেশ উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড়ের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে এবং তার উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর মঙ্গল নিশ্চিত করতে পারে। অবৈধ শিকার ও বনাঞ্চল ধ্বংস বন্ধ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দরবনকে সংরক্ষণ করতে এবং একটি অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে এর টিকে থাকা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ নেবার প্রয়োজন। একটি বিশ্ব সম্প্রদায় হিসাবে আমাদের অবশ্যই সুন্দরবনের অন্তর্নিহিত মূল্যকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সকলের উপকারের জন্য এটিকে রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

লেখকবৃন্দ রাগিব আহসান খান, রাকীন জামান, ড. নিলুফা আহসান ও মো. সমীর আলি-কে যথাক্রমে গবেষণা পত্রটির বাংলা অনুবাদ, গ্রাফিক্সে, ও প্রুফরিডিং সহায়তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

তথ্যসূত্র

Acharja, A. 2024, Project Sundarbans before it is too late. Daily Observer, URL: https://www.observerbd.com/news.php?id=460009 (Accessed: 6/29/2024).

Bandyopadhyay, S. 2019, Sundarban: A Review of Evolution & Geomorphology. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25774.54084.

BD Forest Department. 2024, সুন্দরবনে কার্বন জরিপ (The Sundarbans Carbon Inventory). Forest Department, Peoples Republic of Bangladesh, URL: https://bforest.gov.bd/site/page/6ec068d0-f8ad-4092-8212-39f5bd733c35/- (Accessed: 6/14/2024).

Bera, B., Bhattacharjee, S., Sengupta, N., Shit, P.K., Adhikary, P.P., Sengupta, D., Saha, S. 2022, Significant reduction of carbon stocks and changes of ecosystem service valuation of Indian Sundarbans. Nature, DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-11716-5 (Accessed 6/13/2024).

Circular Conservation. 2020, Natural, Social and Economic Regeneration in the Sundarbans of Bangladesh, URL: https://www.circularconversations.com/earth-heroes/bangladesh-environment-and-development-society (Accessed 6/12/2024).

Datta, A., Rashid, T., Biswas, M. (2021). Sequestration and Storage Capacity of Carbon in the Mangrove Vegetation of Sundarban Forest, Bangladesh. Int. J. Sci. Eng. Res. 12. 1098-1101. DOI: https://doi.org/10.14299/ijser.2021.02.04.

Gain, A.K., Giupponi, C. 2014, Impact of the Farakka Dam on Thresholds of the Hydrologic Flow Regime in the Lower Ganges River Basin (Bangladesh). *Water, 6*: 2501-2518, DOI: https://doi.org/10.3390/w6082501

Ghosh, A., Schmidt, S., Fickert, T., Nüsser, M. 2015, The Indian Sundarban Mangrove Forests: History, Utilization, Conservation Strategies and Local Perception. Diversity, 7: 149-169.

Ghosh, S., Mistri, B. 2023, Cyclone-induced coastal vulnerability, livelihood challenges and mitigation measures of Matla-Bidya inter-estuarine area, Indian Sundarban. Nat Hazards (Dordr), 116 (3): 3857-3878. DOI: 10.1007/s11069-023-05840-2.

Habib, K.A., Neogi, A.K., Nahar, N., Oh, J., Lee, Y.H., Kim, C.G. 2020, An overview of fishes of the Sundarbans, Bangladesh and their present conservation status. J. Threatened Taxa 12(1): 15154-15172, DOI: https://doi.org/10.11609/jott.4893.11.15.15154-15172, URL: https://threatenedtaxa.org/index.php/JoTT/article/view/4893/6634.

Islam, M.M., Borgqvist, H., Kumar, L. 2019, Monitoring mangrove forest landcover changes in the coastline of Bangladesh from 1976 to 2015. Geocarto Int., 34: 1458–1476, DOI: https://doi.org/10.1080/10106049.2018.1489423.

Islam, M.T. 2014, Vegetation Changes of Sundarbans Based on Landsat Imagery Analysis Between 1975 and 2006. Landscape Environ., 8 (1): 1-9, URL: https://ojs.lib.unideb.hu/landsenv/article/view/2304.

Islam, S.M.D.U., Bhuiyan, M.A.H. 2018, Sundarbans mangrove forest of Bangladesh: Causes of degradation and sustainable management options. Environ. Sustain., 1: 113–131, DOI: https://doi.org/10.1007/s42398-018-0018-y.

Islam, S.N. and Gnauck, A. 2008, Mangrove Wetland Ecosystems in Ganges-Brahmaputra Delta in Bangladesh. Front. Earth Sci. China, 2: 439-448, DOI: https://doi.org/10.1007/s11707-008-0049-2.

Jahan, I., Lee, S.U., Panta, S., Ritchie, K. 2017, Farakka Barrage Action Initiative and Response, University of Delaware, Regional Watershed Management. URL: https://www.wrc.udel.edu/wp-content/uploads/2017/07/FREE-Farraka-Barrage-Report-2017.pdf (Accessed: 6/16/2024).

Kanan, A.H., Pirotti, F., Masiero, M., Rahman, M.M. 2023, Mapping inundation from sea level rise and its interaction with land cover in the Sundarbans mangrove forest. Clim. Change, 176: 104.

Kanan, A.K., Masiero, M., Pirotti, F. 2024, Estimating Economic and Livelihood Values of the World's Largest Mangrove Forest (Sundarbans): A Meta-Analysis. Forests, 15: 837, DOI: https://doi.org/10.3390/f15050837.

Khan, S.K., Abdullah, S., Salam, M.A., Mandal, T.R., Hossain, M.R. 2021, Review Assessment of Biodiversity Loss of Sundarban Forest: Highlights on Causes and Impacts. Ind. J. Forestry Res., 8 (1): 85-97. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/1e5b/111546e9bd4f6996ab2e260b13fa2382b0eb.pdf (Accessed: 6/29/2024).

Mukhopadhyay, A., Mondal, P., Barik, J., Chowdhury, S.M., Ghosh, T., Hazra, S. 2015, Changes in mangrove species assemblages and future prediction of the Bangladesh Sundarbans using Markov chain model and cellular automata. Environ. Sci. Process Impacts, 17: 1111–1117, DOI: https://doi.org/10.1039/c4em00611a.

Newcomb, T. 2024, Uh-Oh, the Mangroves Are Rapidly Migrating North. Popular Mechanics, URL: https://www.popularmechanics.com/science/environment/a61414294/why-mangroves-are-rapidly-migrating-north/

Nishat, B., Rahman, A.J.M.Z., Mahmud, S. 2019, Landscape Narrative of the Sundarban: Towards Collaborative Management by Bangladesh and India, URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/539771546853079693 (Accessed: 12/7/21).

Nobi, M.N., Sarker, A.H.M.R., Nath, B., Roskaft, E., Suza, M., Kvinta, P. 2021., Economic valuation of tourism of the Sundarban Mangroves, Bangladesh. J. Ecol. Nat. Environ., 13 (4): 100-109, DOI: https://doi.org/10.5897/JENE2021.0910.

Pletcher, K. 2024, Sundarbans. Britannica, URL: https://www.britannica.com/place/Sundarbans (Accessed: 5/8/24).

Prain, D. 1903, The flora of Sundarbans. Records Botanical Survey of India, 114: 231-272.
Raha, A.K. 2005, Monitoring Changes in Sundarbans Mangrove Forest using RS/GIS, URL:http:// www.gisdevelopment.net/application/environment/wetland/envwm004.htm (Accessed: 6/29/2024).

Rahman, M., JiangI, Y., Irvine, K. 2018, Assessing wetland services for improved development decision-making: a case study of mangroves in coastal Bangladesh. Wetlands Ecol. Manage., 26: 563-580.

Rahman, L. M. 2000, The Sundarbans: A Unique Wilderness of the World. USDA Forest Service Proceedings RMRS-P-15-VOL-2. 143-148, URL: https://www.fs.usda.gov/rm/pubs/rmrs_p015_2/rmrs_p015_2_143_148.pdf (Accessed: 5/9/24).

Rahman, M. M., Chongling, Y., Islam, K. S., Haoliang, L. (2009). A brief review on pollution and ecotoxicologic effects on Sundarbans mangrove ecosystem in Bangladesh. Int. J. Environ. Engineering, 1(4), 369-383.

Rahman, M.M., Khan, M.N.I., Hoque, A.F., Ahmed, I. 2015, Carbon stock in the Sundarban mangrove forest: Spatial variations in vegetation types and salinity zones. Wetl. Ecol. Manag., 23, 269–283.

Rahman, M.S., Hossain, G.M., Khan, S.A., Uddin, S.N. 2015, An Annotated Checklist of the Vascular Plants of Sundarban Mangrove Forest of Bangladesh. Bangladesh J. Plant Taxon., 22 (1): 17-41. URL: https://www.semanticscholar.org/reader/354082c8b997a5927e477e1025e0636f3f47580b (Accessed: 6/29/2024).

Saadi MLK (2010) Hurricane Sidr claims beautiful mangroves. URL: http:// www.islamonline.net (Accessed: 6/29/2024).

Saoum, M.R., Sarkar, S.K. 2024, Monitoring mangrove forest change and its impacts on the environment. Ecological Indicators 159: 111666, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.111666.

Siddiqui, A. H. 2016, Flora and faunal resources and ecosystem conservation in the Sundarbans. Int. J. Agric. Inno. Res, 5(3): 1473-2319.

Sundarban Wetland. 2019, Ramsar Sites Information Service, URL: https://rsis.ramsar.org/ris/2370.

The World bank. 2018, Benefits of Cooperation: Focus on the Sundarbans Identification and Assessment, URL: https://documents1.worldbank.org/curated/zh/384881587110084376/pdf/Benefits-of-Cooperation-Focus-on-the-Sundarban-Identification-and-Assessment-Lead.pdf (Accessed: 6/12/2024).

Uijttewaal, I. 2021, World Mangrove Day: The Value of Mangroves for Marine Life, Coastal Communities and Climate Change, Bazaruto Center Scientific Studies, URL: https://bcssmz.org/the-value-of-mangroves/#:~:text=Because%20of%20the%20incredible%20efficiency,trillion%20in%20services%20every%20year (Accessed: 6/11/2024).

UNESCO. 2024, The Sundarbans, URL: https://whc.unesco.org/en/list/798/ (Accessed: 6/12/2024).

Webber, S. 2024. How do trees store carbon. Creating Tomorrows Forests, UK. URL: https://www.creatingtomorrowsforests.co.uk/blog/technical-note-how-do-trees-store-carbon#:~:text=Photosynthesis,convert%20sunlight%20into%20chemical%20energy (Accessed: 6/23/2024).

Wikimedia Commons. 2011, Irrawadi Dolphin (Credit: Dan Koehl, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons, licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license), URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DKoehl_Irrawaddi_Dolphin_jumping.jpg (Accessed: 6/11/2024).

Wikimedia Commons. 2013, Gewa Tree (Credit: Vengolis, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported), Wikimedia Commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Excoecaria_agallocha.jpg (Accessed: 6/11/2024).

Wikimedia Commons. 2014, Sundarban (Credit: Ferdous, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license., URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sundarban_(61).jpg (Accessed: 6/11/2024).

Wikimedia Commons. 2015, Maps of the Sundarbans (Credit: সুন্দরবনের মানচিত্র, Nirvik12, Public domain, via Wikimedia Commons, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.), Wikimedia Commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sundarbans-de.svg (Accessed: 6/11/2024).

Wikimedia Commons. 2016a, The Sundarban forest river channel, Bangladesh.jpg (Credit: Syed sajidul islam, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license., URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sundarban_(61).jpg (Accessed: 6/12/2024).

Wikimedia Commons. 2016b, Sundari Tree (Credit: Sarangib, CC0, via Wikimedia Commons, made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, Wikimedia Commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sundari_Tree.JPG (Accessed: 6/10/2024).

Wikimedia Commons. 2018a, Sundarban U shape river (Credit: Touhid biplob, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license., URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U_shape_river.jpg (Accessed: 6/10/2024).

Wikimedia Commons. 2018b, Spotted Deer (Credit: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spotted_deer_(Axis_axis)_male.jpg (Accessed: 6/14/2024).

Wikimedia Commons. 2020a, Bengal Tiger (Credit: Charles James Sharp, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license), Wikimedia Commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bengal_tiger_(Panthera_tigris_tigris)_female_3_crop.jpg (Accessed: 6/14/2024).

Wikimedia Commons. 2020b, Saltwater Crocodile (Credit: Bernard DUPONT from FRANCE, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license), Wikimedia Commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saltwater_Crocodile_(Crocodylus_porosus)_(10106344616).jpg (Accessed: 6/14/2024).

World Heritage Datasheet. 1997, The Sundarbans, URL: http://world-heritage-datasheets.unep-wcmc.org/datasheet/output/site/the-sundarbans/ (Accessed: 5/8/24).